আমাদের ছুটি

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

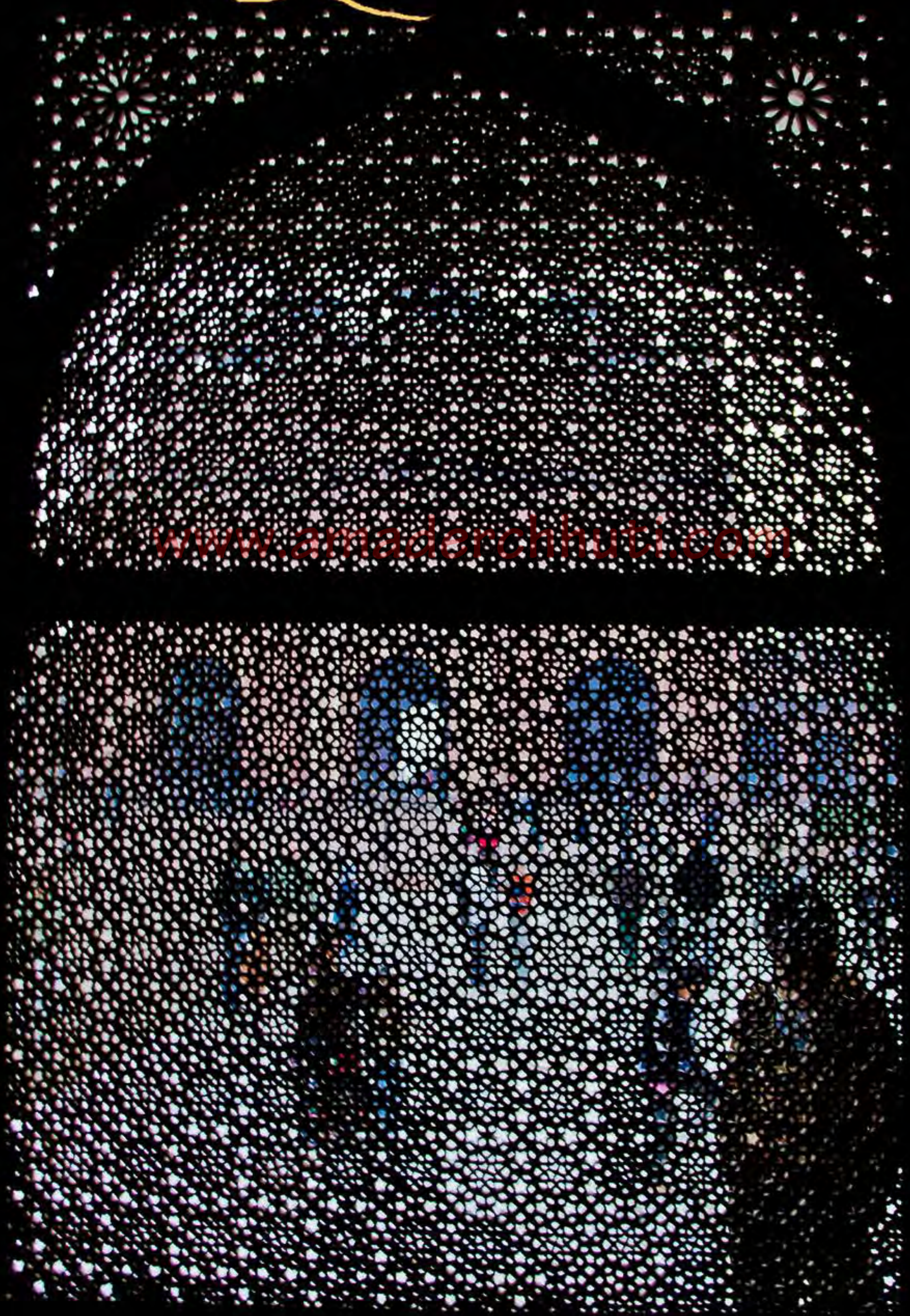

ফতেপুর সিক্রিতে সেলিম চিস্তির দরগায় মার্বেলের জালির কারুকার্য
আলোকচিত্রী - রত্নদীপ দাশগুপ্ত

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা - পৌষ-মাঘ ১৪১৯

চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা একটা লাল ধুলোর রাস্তা
আমি ঐ রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি, আবার আমিই ট্রেনের জানলায়
আমার দু'পায়ে পৃথিবীর রং, কাঁধে একটা পুঁটুলি
ট্রেনের কামরায় অট্টরোল, আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে
একটি ছাগল চড়ানো বুড়ি
লাল ধুলোর রাস্তাটা কোথায় গেছে? দু'পাশে ফসল-কাটা মাঠ
মাঝে মাঝে দু'-একটা তালগাছ, অচেনা বুনো ঝোপ
ঐ দিকের দিগন্তে লেগে আছে বড় মায়াময় জীবন
বিকেলের বাতাসে উড়ছে সম্ভাবনার নীল যবনিকা...
রাস্তাটা এখন অদৃশ্য, ট্রেন ছুটছে আরও দুরন্ত ছটফটানিতে
সকলেরই কোথাও না কোথাও পৌঁছোনোর ব্যগ্রতা
অথচ আমি হেঁটে যাচ্ছি, একটা ছাগলের বাচ্চা তুলে নিলাম বুকে
বুড়িটি ফিক করে হেসে অনাদি কালের ছবি হয়ে গেল।

www.amaderchhuti.com

"লাল ধুলোর রাস্তা" – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা যাদের কৈশোর কেটেছিল ঘন নীল সমুদ্রের মাঝে সবুজ দ্বীপের রহস্য কিংবা এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পাহাড়চূড়ার আতঙ্কের সন্ধান করতে করতে – তারাই আবার বড় হয়ে খুঁজেছি দিকশূণ্যপুরের ঠিকানা, স্নান করতে চেয়েছি সুদূর ঝর্ণার জলে, পায়ে পায়ে হেঁটেছি স্মৃতির শহরে - সুনীলের সঙ্গে তাঁর কবিতায়, ভ্রমণ লেখায়, নীললোহিতের সঙ্গে দিকশূন্যপুরে অথবা সন্তু-কাকাবাবুর সঙ্গে দেশে-বিদেশে বার বার হারিয়ে গেছি, হারিয়ে যাই...। এবার সাঁকো পেরিয়ে একা একাই চলে গেলেন আপাদমস্তক বাঙালি এই বিশ্বনাগরিক দুপায়ে পৃথিবীর রং নিয়ে... এপার ওপার আজ স্মৃতিময় একাকার।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

কথোপকথন

"একবার একটা শিশুগাছের তলায় ছিল আমার তাঁবুটা। দ্বিতীয় দিন চা টা খাওয়ার পর বেরোচ্ছি হঠাৎ লক্ষ করলাম গাছ থেকে চারটে পাতা পড়ল। তৃতীয় দিন দেখলাম একটা হাওয়া দিল, আবার চারটে পাতা পড়ল। চতুর্থ দিন থেকে আমার ভালোলাগতে শুরু করল। আমি বসে থাকতাম পাতাটা পড়ার জন্য"...জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ-ভালোলাগা-মন্দলাগার ছবি ফুটে উঠল বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শিবনাথ বসুর সঙ্গে আড্ডা-গল্পে-গানে।

☐ আরশিনগর ☐

বাঘের বাড়ি – মার্জিয়া লিপি

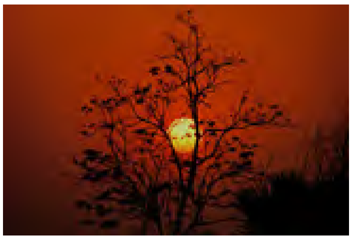

বনে-পাহাড়ে – শুভেন্দু রায়-দেবাশিস মন্ডল-দীপক ভৌমিক

সান্দাকফু – চেনা পথে ফিরে আসার গল্প
– মাহমুদ ফারুক

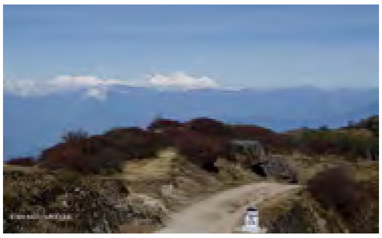

☐ সব পেয়েছির দেশ ☐

ইতিহাসের শহরে - মহুয়া ব্যানার্জি

www.amaderchhuti.com

কাকাবাবু হেরে গেলেন? - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

☐ ভুবনডাঙা ☐

এক ভ্রমণে দুই দেশ – মঞ্জুশ্রী সিকদার

ঝটিকা সফরে সিঙ্গাপুর - মহম্মদ রাশেদুজ্জামান

□ শেষ পাতা □

ঈশ্বর-প্রকৃতি-ভ্রমণ - অদিতি ভট্টাচার্য

জল আর পাখিদের দেশে - বনশ্রী চক্রবর্তী

একদিন সারাদিন কুমিল্লায় - রফিকুল ইসলাম সাগর

কলকাতার কাছেই - অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

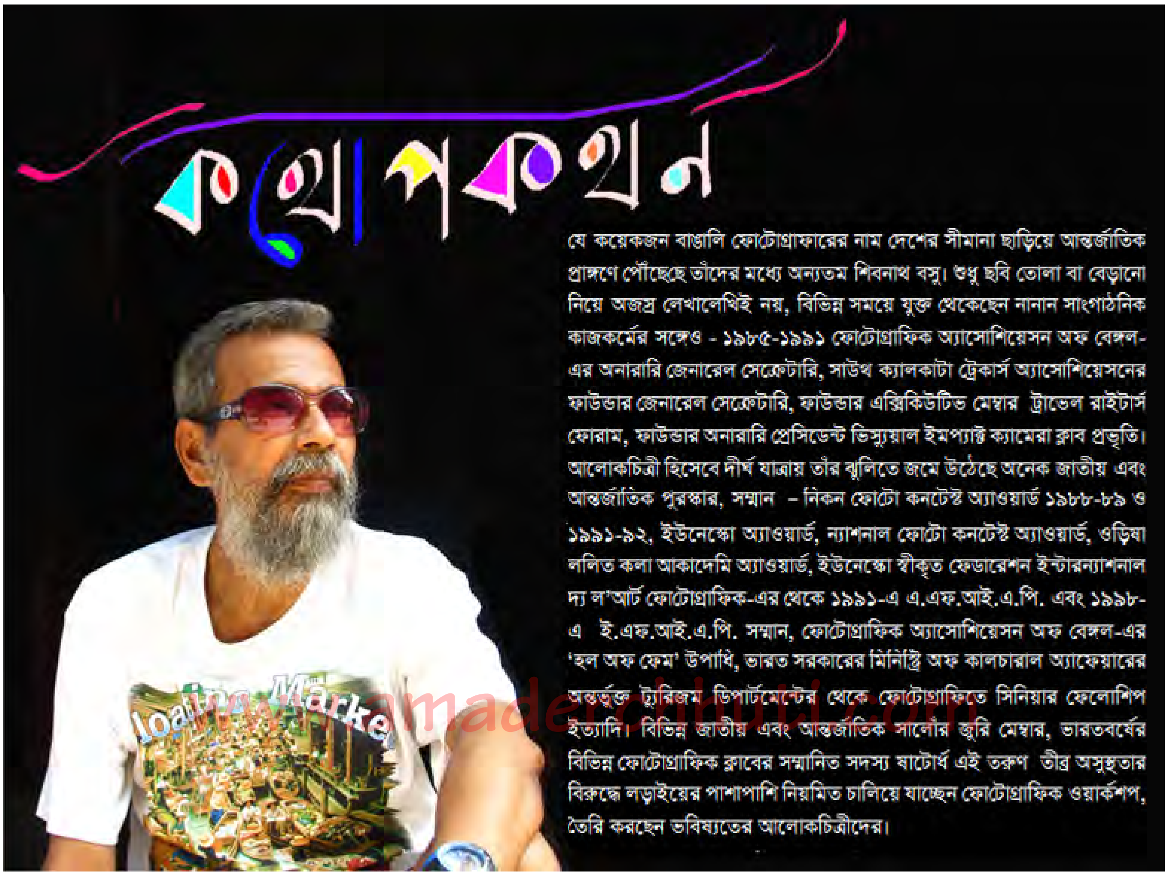

শিবনাথ বসুর ছবির অ্যালবাম

◆ ফোটোগ্রাফি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত - এই দুইই ওতপ্রোতভাবে রয়েছে আপনার জীবনে। ফোটোগ্রাফির কথায়তো আসবই। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথকে কেমনভাবে পেয়েছেন আপনার অনুভবে?

☐ আসলে রবীন্দ্রনাথতো সবার কাছেই প্রিয়, সে অর্থে বলার কিছুই নেই। তবে এই চোদ্দমাস শুয়ে থাকার সময় আমার একটাই সাথী ছিল - গীতবিতান। আমি চোদ্দমাস কিন্তু আর কিচ্ছু পড়িনি, শুধু গীতবিতান পড়েছি আর সুচিত্রা মিত্র-র কথাটা মিলিয়ে দেখেছি যে এখনও আমরা কিছুই বুঝিনা রবীন্দ্রনাথকে। বড়োজোর বলতে পারি যে লোকটা খুব বাজে ছিল, সব কথা বলে গেছে। আমাদের আর কিছু ভাবনার জায়গা নেই। শুধু তাই নয়, এমনধরণের কথা বলে গেছে, যেটা এখন অসুস্থ হওয়ার পর শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এরকম লোক খুব কমই এসেছিল, আনপ্যারালাল বললে ভুল হবে না। অনেকেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, অনেকেই সাহিত্যিক হিসেবে অনেককিছু করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধারেকাছে আমার ধারণা কেউ নেই। উনি যা করে গেছেন, যদি উপলব্ধি করা যায়, তাহলে আর কিছু নিয়ে থাকতে হবে না - পেন্টিং, ফোটোগ্রাফি , সিনেমা - কিচ্ছু দরকার নেই, রবীন্দ্রনাথই যথেষ্ট।

◆ আপনি যেসময় ফোটোগ্রাফি চর্চা শুরু করেন সেইসময় খুব কম বাঙালিই ক্রিয়েটিভ ফোটোগ্রাফিকে পুরোদস্তুর পেশা করার কথা ভাবতেন। এই ভাবনাটা আপনার কীভাবে এল? শুরুটাইবা কেমন ছিল?

☐আমার নিজের এখনও ধারণা, যারা কিছু করতে পারে না তারা হয় ফোটোগ্রাফার নয় মাউন্টেনিয়ার হয়। সেটাই হলুম আর কী...। কিছু করতে পারলামনা, ফোটোগ্রাফার হলাম (প্রাণখোলা হাসি)।

আমি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (পি.এ.বি.)-তে ভর্তি হই। একটা এঁচোড়ে পাকা ছেলে, যার বয়স প্রায় বছর তিরিশেক, কিছুই করতে পারেনি, এমনকী একটা চাকরিও করেনা, হাজির হয়েছে ফোটোগ্রাফি শিখতে, তায় সম্বল একটা পেনট্যাক্স ক্যামেরা, কোন বাড়তি লেন্স নেই। প্রথমে আমাকে ভেতরে বসতে দেয়নি, বলেছিল, পাপোষ আছে, পাপোষে বসতে। ন'মাস বাদে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। আমার একটা চ্যালেঞ্জ তখন ছিল যে, আই উইল গো টু দ্য টপ। একদিন আমি যাব, একটাই চেয়ার আছে, সেখানে যেই বসে থাকুকনা কেন, উঠে আমায় বসতে দেবে। আজকে আমি গেলে সেই চেয়ারেই বসি।

বিজ্ঞাপনের জগতেও একসময় কাজ করেছি, তবে ইনডোরে নয়, আউটডোরে। তখন বিজ্ঞাপনে সমর ঘোষ, সাত্যকি ঘোষ, বিবেক দাস এরা কাজ করে - সব নামকরা লোক। ওরা যে খরচা করে স্টুডিও সাজিয়েছে, আমিতো ওদের ধরতেও পারবনা। আউটডোরে বরং কেউ একটা বড় কাজ করতে চায়না। কী লাইট হবে, কোথায় কোথায় ঘুরতে হবে...। আমাকে তো থাকতে হবে এক নম্বরে! (হাসি) আমি গেলাম বিজ্ঞাপনের আউটডোরে - টমসন, বেস্ট শুরু করে যতগুলো বড় কোম্পানি সবার সঙ্গেই আমি কাজ করেছি, এমনকী এখনও তারা যোগাযোগ রেখেছে, আসে।

◆ ল্যান্ডস্কেপ না পোর্ট্রেট - কোনটা বেশি ভালো লাগে?

☐ ` আমার তোলা ল্যান্ডস্কেপ লোকে ভালো বলে, আমার কিন্তু নিজের পছন্দ ল্যান্ডস্কেপ নয়, মানুষ। একবার পাহাড়ে গেছি - আমাদের টিমের যে ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল। আমায় বলে, তখন সেই সানসেটের দুখানা ছবি তুলে ক্যামেরা বন্ধ করে দিলি কেন রে? বললাম লাল হল...আরেকটু লাল হল...তারপরে সানসেটটা হয়ে গেল, তুললামতো, আর কী তুলব? বলল, তাই বলে মেয়েদের পেছনে ছুটতে হবে? বললাম, মেয়েদের পেছনে ছুটছি না, কিন্তু অদ্ভুত দেখতে মেয়েগুলোকে, দেখছি কোনটা ভালো হয়। সানসেট তুলছিসনা, ল্যান্ডস্কেপগুলো বাদ দিচ্ছিস আর নিজেকে বলবি ল্যান্ডস্কেপার! এটা হয় নাকি? আমি বললাম, আশ্চর্য কথা, সানসেট কিন্তু একই টাইমে হয়, এটা সায়েন্স। রোজ আমরা লক্ষ্য করি না, কোথাও বেড়াতে গেলে দেখি। এতে কোন নতুনত্ব নেই। তেমন একটা মেঘ, একটা গাছ এরকম কোন কিছু বেস করে তুলতে পারলে একটা অন্যরকম ছবি হতে পারে। তাছাড়া শুধু একটা সানসেটের মানে কী? কী হবে তুলে? মেয়েটা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে - রেগে যাচ্ছে, গালাগালি করছে - ছবি তুলবে না, ডোন্ট শুট, তুললে পয়সা দিতে হবে। কখনো কাঁদছে, ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, বাচ্চাকে নিয়ে খেলছে...। একটা বড় মেয়ে যখন কাঁদে-হাসে, তার যে ব্যাখ্যা, যে মানে সেটা অনেককিছু, অনেক বেশি এফেক্টিভ আমার কাছে। রঁদ্যা থেকে এটা শুরু হয়েছিল। ওরা জেন্টস কাস্টকে অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল। পেন্টিং-এ দালি এল, ভ্যানগগ এল তখন আস্তে আস্তে মেল

ফিগারটা কমিয়ে নিয়ে এল ফিমেল ফিগার। আগে গ্রীক মূর্তিতে দেখবে ফিমেল ফিগার কম ছিল, বেশিরভাগই মেল ফিগার। পরে মেল ফিগার কমে ফিমেল ফিগার এল তার অন্যতম কারণ, ঠিকঠাক মেল ফিগার করা অনেক ডিফিকাল্ট। আর ফিমেল ফিগারের কন্ট্যুর, লাইট অ্যান্ড শ্যাডোর কিছু পোর্শন - করতে সুবিধা হয়, আঁকতে সুবিধা হয় - একটু ফাঁকিবাজি দিয়েও হয়।(হাসি)

আমি মেয়েদের ভালোবাসি তাই তাদের ছবি তুলি। ছবি তোলার কিছু নিয়ম আছে। এব্যাপারেও আবার রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরে আসি। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রয়েছে - কুমুর ওই ছবিটা যেন দৈবের রচনা। কপালে যে আলোটি পড়লে কুমুর মনের চেহারাটা মুখে প্রকাশ পায়, সেই আলোটিই পড়েছিল - এটাই হল পোর্ট্রেটের লাইটিং। রবীন্দ্রনাথ একটা ছোট্ট কথায় তাকে বুঝিয়ে গেছেন। আবার 'চোখের বালি' উপন্যাসে একজায়গায় আছে, বিনোদিনী শুয়ে পড়েছে - তখন মহেন্দ্র পা টিপে টিপে এসে দেখল বিনোদিনী ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব সুন্দর দেখতে লাগছিল। মাথার থেকে চুলটা এলো করা। ও আস্তে আস্তে বিনোদিনীকে প্রদক্ষিণ করল। কোনদিক থেকে ছবি তুললে ভালো লাগবে তা দেখতে লাগল। পরে চুলটা একটু সরিয়ে দিল কপালের। ভালো না লাগাতে আবার যা ছিল তাই করে দিল। আশাকে বলল, আস্তে করে লাল শালটা পায়ের দিকে একটু টেনে দাও, মানে ব্যালেন্স করার জন্য। তারপর সে ক্যামেরা নিয়ে এল। তার মানেটা কী? রবীন্দ্রনাথ জানতেন ক্যামেরা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।

◆ আপনার ছবিতে নীল রঙের গভীরতা দেখা যায়। এটা কি জীবনবোধের প্রতিফলন?

☐ নীল মানে কী বলতো? মিথোলজিকাল একটা মানে হয় আবার সাধারণভাবে আরেকটা মানেও হয়। অন্তহীন - এন্ডলেস - যার শেষ নেই। মহাকাশ সম্বন্ধে যখন ভাবি নীলের পরে নীল, কোনো শেষ নেই, মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়। আবার নীল কিন্তু শিবের রঙ। একটু গাঁজা খাওয়া লোক, অল্পেই সন্তুষ্ট। রেগে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ করতে পারে সেতো আলাদা কথা, এমনিতে কিন্তু শান্ত।।

আমার কেন নীল পছন্দ সেটা বলতে গেলে একটা ঘটনার কথা বলতে হয়। একবার শান্তিনিকেতন থেকে সিউড়ি যাচ্ছিলাম। পথে অজয় নদী পড়ে। আর যে বনটা পড়ে অজয়ের আগে, সেটা খুব ঘন ছিল। যেতে যেতে বাসটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। সারানো হবে, আমি চুপ করে বসে আছি। দেখি লোকজন সব টুকটুক করে নেমে পড়ছে - সবাই চলে গেল। ড্রাইভার, খালাসি মিলে একটা চাকা খুললো, কীসব একটু ঠুকঠাক করল, তারপর চলে গেল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কেউ নেই। আমার সম্বল বলতে পাঁচটা টাকা আর পেনট্যাক্স ক্যামেরাটা আর মোটে চারটে সিগারেট। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে রুকস্যাকটা নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। খুব ডাকাতের ভয় এখানে। কী করে রাত কাটাব, কী করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। দূরে অজয় দেখা যাচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে গেলাম। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে মশাটশা অগ্রাহ্য করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়েও পড়েছিলাম কোন একটা সময়। হঠাৎ কানে এল স্তোত্রপাঠের আওয়াজ - এরকমতো কালকূটের লেখায় আছে। দেখি 'বল হরি' ডাক দিতে দিতে একদল লোক আসছে। শ্মশান! একটা বাচ্চা মেয়েকে পোড়াতে এসেছে। শ্মশানেই শুয়েছিলাম সারারাত, বুঝতে পারিনি! 'ওঁ জবাকুসুম' সূর্যমন্ত্র কানে আসছে... আর তখন পুরো ব্লুকাস্ট... নীলাভ একটা রঙ, আর কোন রঙ নেই। সেই প্রথম নীল রঙটা চোখে লাগল - জীবন-মৃত্যুর সন্ধিতে দাঁড়িয়ে। জীবনটাকে জানতে আরম্ভ করলাম। তখন থেকে নীলটাই আমার সবচেয়ে প্রিয়।

◆ অ্যানালগ আর ডিজিটাল - ফোটো তোলার এই দুই মাধ্যমেই আপনি স্বচ্ছন্দ - কোনটা বেশি ভালো বলে মনে হয়?

☐` 'নায়ক' সিনেমায় একটা কথা ছিল, মানিকদারই লেখা - কথাপ্রসঙ্গে একটা জায়গায় উত্তম বলছেন - হ্যাঁ, যেকারণে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রয়োজন হয়। ডিজিটাল ক্যামেরাতেও সেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রয়োজন। মোর প্রোডাকশন অ্যান্ড মোর রাবিশ প্রোডাকশন। পি.এ.বি.-তে প্রচুর ছবি দেখতে হত, তাও কী একেকজনের দু রোল-তিন রোল। আমি একটা এক্সপেডিশনে গেছি, তিনরোল ছবি তোলা মানে একশো আটটা ছবি। এর মধ্যে হয়ত আশি-নব্বইখানা ছবি আমার থাকে লোকজনকে দেখানোর মত। তখন যেসব ছেলেমেয়েরা আমার কাছে ক্লাস করত ওই তিনরোল-চাররোল নিয়ে এল, দেখলাম দু'মিনিট - এই চারটে ছবি ভালো আছে বলে দিলাম। আর এখন তারা ১৬ জিবি ছবি নিয়ে আসে - দু'হাজার ছবি - একটু দেখে দেবেন স্যার! না। আমার কম্পিউটারে ১৬ জিবি জায়গা খালি নেই, আর ১৬ জিবি ছবি দেখতে গেলে আমার মাথা ঘুরে যাবে। ওর থেকে বাছা যায় না। এখন একটা হনুমানের ল্যাজ, তাই তোল - কী যে তুলছে, কী যে আগডুম-বাগডুম হচ্ছে আমি জানি না।

তবে ডিজিটালের অনেক সুবিধাও আছে - শুট করলে, ইরেজ করলে... বলতো এটা কোন সিনেমা? (দুষ্টু হাসিমুখে উঠে গিয়ে 'আবহমান' সিনেমাটা চালালেন। কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেসে উঠল কালিম্পং-এর সকাল - দীপঙ্কর দে আর যীশু সেনগুপ্তের কথোপকথন -

- ল্যাটিচুড মানে বোঝ?
- ল্যাটিচুড? ইমাজিনারি হরাইজোনটাল লাইনস দ্যাট রিভার্স দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ?
- ফিল্মে আমরা যখন ল্যাটিচুড বলি..
- রেঞ্জ... স্কোপ... টলারেন্স।
- তুমিতো ভিডিওতে কাজ করেছ?
- সেলুলার ল্যাটিচুড এটার থেকে অনেক বেশি বাবা!
- ভিডিওতে ইরেজ করে আবার যখন রেকর্ড কর সেটা বোঝা যায়?
- তুমি কী ভিডিওতে কাজ করার কথা ভাবছ? তোমার ভালো লাগবেনা বাবা। ডেনসিটি পাবে না, টোন পাবে না, তাছাড়া ফিল্মের লঞ্জিভিটি অনেক বেশি।
- তাতে লাভ? কদিন পরে দেখলে সব কাজটাই মনে হয় কিছু হয়নি। তোমার মনে হয় না?
- এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব...
- বরং এটাইতো ভালো - শুট করলে, ইরেজ করলে, আবার শুট করলে, আবার ইরেজ করলে...পছন্দ হলনা নতুন করে এডিট করলে, আবার ইরেজ করে দিলে...যেকোন মোমেন্টে আবার নতুন করে শুরু করা যায়।)

সিনেমাটা বন্ধ করে হাসিমুখে বলে চলেন, শুট করলে, ইরেজ করলে, আবার শুট করলে, আবার ইরেজ করলে...

◆ আচ্ছা, ফোটোগ্রাফার না হলে অন্য কী হতেন?

☐সিনেমার পরিচালক হতাম। (হাসতে হাসতে)

◆ একটা সময় বেশ কিছুকাল সত্যজিত রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন - আপনার ঘরটায় ঢুকলেও যেটা মনে হয় সত্যজিত রায়ের একটা প্রভাব আপনার ওপর ভীষণভাবে রয়েছে - সত্যজিতের শুটিং-এর ছবি, এই যে কম্পিউটারে ওঁর করা মিউজিক বাজছে...এই সব কিছু মিলিয়েই। পরিচালক হওয়ার ইচ্ছেটাও কী তাঁর প্রভাব?

☐ হয়তো। আমার কাছে ফিল্মের শেষ কথা সত্যজিত রায়। মানিকদার বই আমি প্রথম দেখি 'পথের পাঁচালী'। তখন নামটাম জানতাম না, জানার মত আমার বয়সও নয়। বইটা প্রাইজ টাইজ পেল শুনলাম। আবার ইন্দিরা হলে এল। বাবা বলল আবার দেখতে যাবে, মাও তাই, আমি বললাম, আমিও যাব। কেন জানিনা তখনই আমাকে বইটা হন্ট করেছিল। তারপর 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', সত্যজিতের আরও যা যা ছবি রিলিজ করছে, কী কাজ করছেন, না করছেন সব খোঁজ রাখতাম। ৬৩ সালে 'মহানগর' বেরিয়েছে, আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, একটা সমালোচনা লিখে আনন্দবাজারে পাঠিয়েছিলাম, সেটা ছাপাও হয়েছিল। সেইসময়

থেকেই মানিকদার ছবিতে আমার আগ্রহটা তৈরি হয়। তখন অবশ্য মানিকদা নয়, সত্যজিত রায়ই বলতাম। পরে আমি বিয়েও করেছিলাম রায় পরিবারেই। সেইসূত্রে আমার যাওয়ার একটা সুযোগও হল। মনে হল, বহুদিনের ইচ্ছাটা মেটাই, যাই তাহলে। সবাই আমাকে বলল, তুমিতো সবে কাজ শুরু করেছ, ভালো কাজও করছ, মানিকদাকে বললে নিশ্চয় তোমাকে কাজ দেবেন। আমি বললাম, না, ছবি দেখাতে পারি, গল্প করতে পারি, কিন্তু কাজ চাইতে পারব না। আমি প্রথম দিনই বললাম, আপনার কী বই আরম্ভ হচ্ছে? বললেন, 'ঘরে বাইরে'-র শুটিং চলছে। বললাম, শুটিং দেখতে যাব। বললেন, হ্যাঁ, এস। ওনার কাছে একটা জিনিস শিখেছিলাম, সেটা হল টাইম মানে টাইম - আড়াইটে মানে আড়াইটেই, দুটো পঁয়ত্রিশ নয়। ওনার বইতে কত সূক্ষ্ম জিনিস থাকে যেটা শেখা যায়। আমি এককেটা বই দেখেছি বোধহয় দুশো-তিনশবার করে, প্রায় মুখস্ত। যেকোনো বইয়ের ডায়লগ বলতে পারব, ইন্টারলুড মিউজিক বলতে পারব। আমি সত্যজিতের মিউজিকের ভীষণ ফ্যান। 'চারুলতা' পরপর তিনদিন দেখি। একদিন হল থেকে বেরোচ্ছি - ওপর থেকে সত্যজিত আর হেমন্ত নামছেন। হেমন্ত বলছেন, আর তো মিউজিক করা যাবে না মানিকদা, আপনি যা করেছেন! সত্যজিত হাসলেন।

◆ আপনার লেখা একটি ভ্রমণকাহিনি সংকলন বেরোচ্ছে শুনলাম। আপনিতো অনেক ঘোরাঘুরি করেছেন, শুধু ছবি তোলাই নয়, বেড়ানো নিয়ে আপনার প্রচুর লেখাও আছে। অথচ সেভাবে ভ্রমণলেখক হিসেবে আপনাকে পাইনা কেন?

□ আমার লেখা প্রায় সাত-আটশো আছে। তবে তথাকথিত ভ্রমণকাহিনি - শিলং-এ কী করে যেতে হয়, গৌহাটিতে যাবে না কোথায় যাবে, প্লেনে যাবে না কীসে যাবে, বড়াপানি আছে না শিলং পাহাড়ে কী আছে - এসবতো আমি লিখি না। আমার গোটা পনেরো লেখা নিয়ে একটা সংকলন বার করছে রূপসী। সব কটা কাহিনির মধ্যেই একটা মোচড় আছে। শিলং নিয়ে লেখাটার কথাই বলি - এগারোটা বেজে গেছে। রাত্তিরবেলা, আলোগুলো সব নিভে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে আসছি, হট্ করে কয়েকজন লোক আমাকে জাপটে ধরল। 'বস্ দেখতো' - একজন আমার মুখে টর্চ ফেলল। জীবনে সেই প্রথম 'কোল্ড সোয়েট' হল। সেকেন্ডের মধ্যে অদ্ভুত ঠাণ্ডা একটা ঘামের স্রোত ঘাড় থেকে শুরু করে একেবারে প্যান্টের নীচ অবধি চলে গেল। টর্চটা মারবে, দেখবে, দেখে শুট্। বলল, নাঃ। চলে গেল। এই যে ঘটনাটা এটা দিয়েই শুরু করেছি। অনেক প্রশংসা পেলেও লেখাটা কিন্তু কোনদিনই আমার কাছে বড় কিছু নয়, আমার এখনও শখ ছবি বানানো, স্টিল নয়, স্টিলতো বাধ্য হয়ে করেছিলাম।

◆ বেড়ানোর প্রসঙ্গে আসি - ছবি তুলতে গিয়ে বা কর্মসূত্রে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, কোন জায়গাটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে?

□ ভালোলাগাটা মনের ওপর। যদি মনের ভালোলাগে, তাহলে সবই ভাললাগবে। তখন নিয়মিত ক্যাম্পে যেতাম। একবার একটা শিশুগাছের তলায় ছিল আমার তাঁবুটা। দ্বিতীয় দিন চা-টা খাওয়ার পর বেরোচ্ছি হঠাৎ লক্ষ করলাম গাছ থেকে চারটে পাতা পড়ল। তৃতীয় দিন দেখলাম একটা হাওয়া দিল, আবার চারটে পাতা পড়ল। চতুর্থ দিন থেকে আমার ভালো লাগতে শুরু করল। আমি বসে থাকতাম পাতাটা পড়ার জন্য।

(কথা বলতে বলতে শিবনাথদার তোলা ছবির স্লাইড শো দেখছিলাম আমরা - ব্যাকগ্রাউণ্ডে বাজছিল একটা অচেনা সুর) - এই যে মিউজিকটা শুনছ - নর্থ ওয়েস্ট আমেরিকাতে কিছু পার্ক আছে, সেখানে বিকেলবেলায় ভিখিরিরা আসে পিয়ানো নিয়ে, টেপরেকর্ডার নিয়ে। ওরা বাজনা শুনিয়ে ১-২ ডলার নেয়। তুমি চাইলে তোমাকে একটা সিডি করে দেবে। কী অদ্ভুত সেই বাজনা। ওই পরিবেশে বসে শুনতে শুনতে একটা অন্যরকম ভালোলাগে। আমার কাছে এরকম নানাধরণের বাজনার সংগ্রহ আছে। আমার জীবনটাই এখন চলে মিউজিকের ওপর বেস করে - হয় রবীন্দ্রনাথের গান, নয়তো মানিকদার মিউজিক, গিটার, অন্যকিছু।

www.amaderchhuti.com

আমরা প্রথমবার দার্জিলিং যাচ্ছি - জীবনে প্রথম পাহাড় দেখব। কিছু ছেলে বলতে শুরু করল, ছোটনাগপুরটাই ভালো ছিল - লাল মাটি, সাঁওতাল, মাদল। দার্জিলিংটা যে কেন মাথায় এল, হিমালয়ে যে কী সুখ আছে কে জানে! আগে থেকেই বলতে আরম্ভ করেছে তাদের দার্জিলিং ভালো লাগেনি। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই মনে হয়েছে যে দার্জিলিং আমার ভালো লাগবে। সেভাবে আলাদা করে কিছু নেই তবু আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স দুটো জায়গার নাম বলতে যদি বল, বেনারস আর দার্জিলিং। বেনারসে মানুষ দেখা আর দার্জিলিং-এর ভালোলাগা বলতে গেলেতো অঞ্জন দত্তের মতোই বলতে হয় - কিছু গলি আছে, খাবার জায়গা আছে, ক্যাভেন্ডার আছে। নেপালি মেয়েগুলো কি স্মার্ট বলতো?

◆ শুরুর লড়াইটা পেরোনোর পর একটা সময় এসেছে যখন স্বীকৃতি পাচ্ছেন - নানান পুরস্কার, পত্রপত্রিকায় লেখা-ছবি বেরোচ্ছে, সেই অনুভূতিটা কিরকম?

□ অবশ্যই ভালোলেগেছে, এখনও ভালোলাগে। তোমাদের যে ছবিগুলো দিলাম ‘আমাদের ছুটি’র অ্যালবামে রাখার জন্য তার অনেকগুলোই তো পুরস্কার পাওয়া। তবে তিরস্কারওতো কম জোটেনি, আর সেটা অকারণেই। তুমি জিজ্ঞাসা করনি, তাও বলছি, বছর কয়েক আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক একটা বড় ফোটোগ্রাফি কম্পিটিশনের আয়োজন করেছিল, জানো বোধহয়। কম্পিটিশনে কোন প্রাইজ নেই, এটা কিন্তু এন.জি.এম. ডিক্লেয়ার করল অনেক পরে। ওদের বক্তব্য ছিল যে ওরা টেস্ট করে দেখছে ডিজিটাল ছবি কত জমা পড়ে? এক কোটি বাইশ লক্ষ ছবি পড়ল। যেটা ফিজিকালি কোন মানুষের পক্ষে জাজিং করা সম্ভব নয়। লেট অক্টোবরে অ্যানাউন্স করল পিপল’স জাজিং হবে - ফোর্থ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোট হবে। আমি খুলতাম না, কোনদিন প্রাইজের তোয়াক্কা করিনি - পাঠিয়েছি ব্যস। এন্ড অফ নভেম্বরে আমাকে অন্যরা খবর দিল, তোর ছবিটা কিন্তু উঠেছে, তিরিশে আছে। মানে? ! এক কোটি বাইশ লক্ষ ছবি জমা পড়েছে, কত কোটি কোটি মানুষ ভোট দিচ্ছেন, সেখানে তিরিশ জনের মধ্যে আমার তোলা ছবি আছে!! একদিন খুললাম। তখন দেখাচ্ছে ওটা দশজনের মধ্যে রয়েছে, তিরিশজনও নয়। আমার আগ্রহ হল, দেখতে আরম্ভ করলাম। আমি এক নম্বরে গেলাম। এক্সপেক্টেড ডেটের সাতদিন আগেই - ২৮ নভেম্বর। শেষ সাতদিন রোজই খুলতাম - কী হয় দেখার জন্য। আমিই প্রথম হলাম এক কোটি কত ভোট পেয়ে। ওরা কনগ্রাচুলেট করল, চিঠি দিল। পরে বলল পুরো সাইজের ছবিটা পাঠিয়ে দাও। আমি বললাম সিডিটা আছে, পোস্ট করতে হবে। অত বড় ছবি সরাসরি আপলোড কীভাবে করা যাবে তাতো জানি না। আমি সাতশো টাকা দিয়ে পোস্টে পাঠালাম। ওরা দেখেটেখে বলল যে ওটা জালিয়াতি ছবি। সবচেয়ে বেশি কমপ্লেন গিয়েছিল নাকি কলকাতা থেকেই। আমারই চেনা কিছু মানুষ এর পেছনে ছিল। তাদের মতে আমি ছবিটা জুড়ে দিয়েছি। তারা সবাই লিখল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে - টাইমস-এও বেরোল। আমি শেষকালে ছেড়েই দিলাম, কিছু বললাম না। সারা পৃথিবীর লোক যারা ভোট দিয়েছে তারা যখন সকলেই মূর্খ আর ওরাই শুধু চালাক, তাহলে তাই। লোকেদের মতামত নিতে গেছ কেন? আগেইতো বাদ দিতে পারতে ছবিটা। এন.জি.এম. কিন্তু ছবিটা রিজেক্ট করেনি - পেণ্ডিং অ্যান্ড উইথহেল্ড - ব্যাপারটা সাসপেন্ড করে রেখেছে। তার মানে ওরাও কিন্তু একটা জায়গায় আটকে আছে।

আমি কিন্তু মিরর রিফ্লেকশন, হাফ রিফ্লেকশন, টোটাল রিফ্লেকশনের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো জানতাম না, পরে জেনেছি যে জলীয় বাষ্পের মধ্যে যদি ধূলিকণা থাকে তাহলে মিরর রিফ্লেকশন হয়। কিছু না জেনেই একটা ঠিকঠাক মুহূর্ত পেয়েছিলাম, যেটা সহজে পাওয়া যায়না। ছবি তুলেছি, দিয়েছি, ব্যস। আমি ক্লাসেও ছবিটা দেখাই। আশ্চর্য ব্যাপার যে সেটা নিয়ে এখনও লোকে আমাকে ব্যঙ্গ করে! এক্ষেত্রেও সেই রবীন্দ্রনাথের কথাই আবার বলতে হয় - 'চতুরঙ্গ'-এ এক জায়গায় সতীশ বলছে, কিছু লোক আছে যারা নিন্দে করতে ভালোবাসে, নিন্দেকেই সত্য বলে জানে। তারাতো নিন্দা করবেই, ক্ষতি কী হয়েছে?

একবছর পর ২০০৯-এ ব্লগে লিখেছিলাম, শরীর খারাপের ঠিক পরে - আমি হয়তো আর বাঁচব না, কিন্তু মরে যাওয়ার পরে তোমরা যদি বল আমাদের ভুল হয়েছিল, তখনতো আমি আর থাকব না।

◆ এখনও নিয়মিত আলোকচিত্রী তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই যে ফোটো তোলার একটা প্রচন্ড ক্রেজ দেখা যাচ্ছে সর্বত্র - ফ্লিকার-ফেসবুক - এটা আপনার কী মনে হয়?

☐ যাদের অ্যানালগের জ্ঞানটা আছে তারা ভালো তুলছে। যারা শুধুই ডিজিটালের জ্ঞান নিয়ে আসছে তারা কিন্তু হুড়ুমদুড়ুম তুলছে। ছবি তোলার বেসিক ব্যাপারগুলো জানতে হবে আর কোনটা ছবি হতে পারে সেই ধারণাটা পরিস্কার রাখতে হবে। এগুলোই শেখার ব্যাপার। ফেসবুক খুললেই বোঝা যায়, দিনে একটা কী দুটো ছবি ভালো থাকে। বাদবাকীগুলো ছবি নয়, দিচ্ছে, দিচ্ছে। লোকেরা নাইস বলে যাচ্ছে। ফেসবুকটাতো পুরোটাই পিঠ চাপড়ানোর ব্যাপার।

◆ ফেসবুকে আপনার তাজপুর-মন্দারমনির ছবিগুলো দেখছিলাম - ছবিগুলোতো দারুণ, আমার বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু আমার সবথেকে ভালো লেগেছে ক্যাপশনে রবিঠাকুরের গানের ব্যবহার।

☐ চোদ্দমাস ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পরে ওই বেড়ানোটায় একটা অন্যরকম আনন্দ পেয়েছিলাম। আমরা ষাটোর্ধ তরুণ-তরুণীরা মিলে এনজয় করেছিলাম খুব। আমার অসুস্থতার পুরো সময়টা ধরেই আমার স্ত্রী রূপা আর মেজ বৌদি উমা বসু অবিশ্রান্ত কষ্ট করেছেন, ওনারা না থাকলে আমি এই সুস্থতাতেও হয়তো পৌঁছাতে পারতাম না। তোমাদের এই ছবিটা দিলাম, এটা আমার অনেকদিনের একটা ইচ্ছাপূরণ বলতে পার। কাগজে অনেকদিন আগে একটা ছবি বেরিয়েছিল - শোভা সেন উৎপল দত্তকে চা এগিয়ে দিচ্ছেন। সেটা দেখার পর থেকেই এই ছবিটা তোলার ইচ্ছা হয়েছিল। এবার বেড়াতে গিয়ে তুলে ফেললাম রূপার সাথে।

[আনন্দময় মানুষটির সঙ্গে দীর্ঘ তিনঘন্টার আড্ডার শেষে বেঁচে থাকার অনেকখানি রসদ অনুভবে নিয়ে উঠে আসছি, বললেন যাওয়ার আগে একটা প্রিয় গান শুনে যাও - ইউটিউবে সার্চ দিতে বিক্রম সিং-এর গাঢ় গলায় বেজে উঠল - নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে...]

সাক্ষাৎকার - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

[শিবনাথ বসুর ছবির অ্যালবাম](#)

Rate This : - select -
Total Votes : 19
Average : 4.05

Like 26 people like this.

tell a Friend

বাঘের বাড়ি

মার্জিয়া লিপি

তথ্য - সুন্দরবন

~ সুন্দরবনের আরো ছবি - মহম্মদ রাশেদুজ্জামান ~

বছর কয়েক আগের দেখা সুন্দরবন।
রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, নানা রঙের পাখি, গাছ আর জলের কুমির নিয়ে সুন্দরবন। বনবিভাগে থেকে ইকোটুরিজ্যম গবেষণায় সুন্দরবনের দুর্গম গহীনে যেয়ে দেখেছি দর্শনীয় অনেক কিছুই। সেবার ট্যুরে এসেছিলাম সাতক্ষীরা রেঞ্জ দিয়ে - কারণ একটাই, সমগ্র সুন্দরবনের মধ্যে এই সাতক্ষীরা রেঞ্জেই সবচেয়ে বেশি দেখা হয়ে যায় বাঘের সাথে।
ইউনেস্কো, ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে 'বিশ্বের ঐতিহ্য' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একক এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যে জালের মতো জড়িয়ে আছে সামুদ্রিক জলধারা। রয়েছে বাদাবন আর ছোট ছোট দ্বীপ। নতুন চরে জেগে উঠে ধানসী, পরে কেওড়া, গরান, বাইন, পশুর, ধুন্দল, সবশেষে সুন্দরী গাছ। অনেকের মতে সুন্দরী গাছের নামে এ বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুন্দরবন, যেখানে সময়ের সঙ্গে সৌন্দর্যের রঙ বদলায়। নির্জন দুপুরের রূপ অচেনা, ভোরগুলো আবার অন্যরকম স্নিগ্ধ।

www.amaderchhuti.com

সুন্দরবন অভিযান টিমে ছিলাম ছ'জন সহকর্মী ছাড়াও বন বিশেষজ্ঞ খসরু চৌধুরী, বিদেশি পরামর্শক, জাহানারা নূরী, গাইড, কেবিন ক্রু, ক্যামেরাম্যান ও দুজন ফরেস্ট গার্ডসহ মোট বাইশজন। খুব সকালে আমরা ঘাটে এসে পৌঁছলেও জাহাজের কিছু যান্ত্রিক সমস্যার কারণে যাত্রা শুরু করি মাথার উপর সূর্যকে রেখে। জাহাজ চলার আধ ঘন্টার মধ্যেই দ্য গাইড ট্যুরের মুগলী ভাইয়ের হঠাৎ চিৎকারে চোখ পড়লো একটা শুশুক পরিবারের উপরে। ঝুপ করে এক ডুব দিয়ে একটু পরেই আবার পানিতে ভেসে উঠছে ছোট বড় শুশুকগুলো, ভাসছে আর ডুবছে।
বুড়িগোয়ালিনির কাছাকাছি কলাগাছি বনটহল ফাঁড়িতে নেমে অ্যাডভেঞ্চার শুরু। কলাগাছি ফরেস্ট ক্যাম্পের ঠিক পেছনে রয়েছে বনের ভিতর দিয়ে একটা হাঁটা পথ। এ পথে শুধু মানুষ নয়, বাঘও হাঁটাহাঁটি করে। শেষ বিকেলে বনের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে তার প্রমাণও পেলাম।
একটু দুঃসাহসী হয়ে কলাগাছি থেকে সন্ধ্যায় জাহাজে উঠে যাত্রা শুরু করি মান্দারবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার পর গাঢ় অন্ধকার নেমে এলো সুন্দরবনের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা নদীর বুকে। বাতাসে লোনা পানির গন্ধ, নিশাচর জন্তু-জানোয়ারের পদচারণে রহস্যময় রাত। নির্জনতার রূপ যেন অচেনা, অন্যরকম। ঘোর নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে শুধু ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চার্জ লাইটের আলোয় রাতের অরণ্যের রহস্যময় দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে যখন দল বেঁধে কয়েকটা নৌকা আমাদের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে তখন মনে মনে ভাবছিলাম রূপকথার জলদস্যুদের কথা। অবশেষে মাঝরাতে জাহাজ নোঙর করলো মান্দারবাড়িয়ার সমুদ্র সৈকতে।
হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর তীরে মান্দারবাড়িয়ায় বন আর বেলাভূমির যুগল মিলন। আমার দেখা এক অন্য রকম অপার্থিব দৃশ্য। অনুভবে দেখছিলাম প্রকৃতির অতলে সৃষ্টির বিচিত্রতার বিস্ময়! ভোরের আলোতে কেবিন থেকে বের হয়ে দেখি এক পাশে বিশাল সমুদ্র আর অন্য পাশে ঘন বন। বৃক্ষ আচ্ছাদিত রহস্যময় অরণ্য, মনের রহস্যকে আনমনা করে দেয়, মনোজগতে তৈরি হয় এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার টান।
প্রায় আট কিলোমিটার লম্বা এই সমুদ্র সৈকত যেন ছবির মত। অসম্ভব ভালোলাগার আচ্ছন্নতায় মুগ্ধ আমি। কক্সবাজার, টেকনাফ, উখিয়া, ইনানী, সেন্টমার্টিনসহ বঙ্গোপসাগরের অনেকগুলো সৈকত বেশ কয়েকবার দেখেছি। সুন্দরবনে এসে এত বড় একটি সৈকতের দেখা পাব ভাবতেও পারিনি। কিন্তু মান্দারবাড়িয়া সৈকতের সাথে অন্যকোন সৈকতের একটুও মিল নেই। অপূর্ব সৌন্দর্য ঘেরা এক জায়গা। পিছনে সবুজ রহস্যে ঘেরা বনে বাঘের ভয় আর সামনে অসম্ভব ভালোলাগার হাতছানি দেওয়া সমুদ্র, বিস্তীর্ণ সৈকত। নির্জন সৈকতে নিজেকে নষ্টালজিয়ার লাল-নীল-সবুজ লতাপাতার জালে জড়িয়ে খুঁজতে থাকি অন্যরকম এক অনুভূতি।
সকালে সী-বিচে ঘুরতে ঘুরতে পেলাম সামুদ্রিক কচ্ছপ, রানি কাকড়ার দেখা, হরিণ আর বাঘের পায়ের ছাপ। তার মানে বিচে কিছুক্ষণ আগেই হরিণ আর বাঘেরা হাঁটাহাঁটি করেছে। মান্দারবাড়িয়ায় ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে শুনলাম, ভোর বেলায় বাঘ এসেছিল। বাঘের পায়ের ছাপ দেখার পর থেকে আবারও বাঘ দেখার নেশা আরেকটু জাঁকিয়ে বসলো। পায়ের ছাপের পিছুপিছু কিছুদূর যাওয়ার পর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম জাহাজে। এর দক্ষিণে তালপট্টি। সুন্দরবনে এমন অনেকগুলো ছোট-বড় সমুদ্র সৈকত আছে। কচিখালি থেকে কটকা এরকমই নির্জন সুন্দর ৭কি.মি. দীর্ঘ আরেকটি সমুদ্র সৈকত।
উদ্দেশ্য এবার হিরণ পয়েন্ট। দুপুরের মধ্যে পুষ্পকাঠির হিরণ পয়েন্টে পৌঁছে গেলাম আমরা। দলের মধ্যে থেকে তিনজন হিরণ পয়েন্টের পিছনের হাঁটা পথ ধরে পায়ে পায়ে চলতে শুরু করলাম ক্যামেরা অন করে। এবারও আমাদের সাথে ফরেস্ট গার্ডেরা রয়েছেন। বনের ভিতর কোস্টগার্ডের দপ্তর থেকে প্রায় আধা মাইল খানেক আসার পর দেখি বিশাল শন বন। এ পথের শুরুতে কয়েকজনের সাথে দেখা হলেও এখানে এসে আর কাউকেই পেলাম না। শন বনের আবহাওয়াটা কেমন যেন একটু গুমোট। স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। নীরব, নিস্তব্ধ এলাকা। হাওয়ায় শন গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। একটু শব্দ হলেই গা ছমছম করে উঠছে। এই বুঝি বাঘ এলো। বাঘের ছবি তোলার নেশায় আবার সাহস জোগাচ্ছি একে অপরকে। কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছি না। হঠাৎ শন বনের মাঝে আবিষ্কার করলাম হেলিপ্যাড। প্রায় পুরো জায়গাটাই শনে ঢেকে আছে। দূর থেকে বোঝার উপায় নেই যে এখানে হেলিকপ্টার নামে। সেখান থেকে আরও একটু এগিয়ে গেলাম ঘন বনের দিকে। জানি না কোথাও বসে বাঘ বিশ্রাম নিচ্ছে, নাকি শিকারের আশায় চুপচাপ ঘাপটি মেরে অপেক্ষায় আছে? বাঘের পায়ের ছাপ দেখতেই ভয়টা সবাইকে আরও বেশি ঘিরে ধরল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি আশেপাশে কোথাও বাঘ আছে।
তখন বিকেল নেমে আসছে সুন্দরবনে... ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের পাল দিগবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দ্রুত ছুটছে আর ছুটছে...

www.amaderchhuti.com

~ তথ্য - সুন্দরবন ~ সুন্দরবনের আরো ছবি - মহম্মদ রাশেদুজ্জামান ~

লেখিকা ও পরিবেশবিদ মার্জিয়া সরকারি কাজের সূত্রে এবং ভালবাসার টানে ঘুরে বেড়ান বাংলাদেশের আনাচেকানাচে। প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ নিয়ে সেই অনুভূতির ছোঁয়াই ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে। প্রকাশিত বই 'আমার মেয়েঃ আত্মজার সাথে কথোপকথন'।

বনে-পাহাড়ে

শুভেন্দু রায়, দেবাশিস মন্ডল, দীপক ভৌমিক

~ বড়ন্তি-পঞ্চকোটের তথ্য ~ বড়ন্তির আরো ছবি - সিন্টু ভট্টাচার্য ~

বড়ন্তি পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের প্রায় বেলা বারটা বাজল। এখানে আমাদের আগামী দিন তিনেকের ঠিকানা বড়ন্তি ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড নেচার স্টাডি হাট। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আড়াইটে নাগাদ আমরা ঘুরতে বেরোলাম। বড়ন্তি পাহাড়ের একদিক দিয়ে উঠে বড়ন্তি গ্রামের পিছন দিকে শাল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নেমে এলাম। পাহাড়ের ওপর থেকে জলাধার ও চারিদিকের ধানখেত যেন পটে আঁকা ছবি।

জীবনপুর হয়ে ড্যামের শেষ প্রান্তে একটা ব্রীজ আছে, সেটা পেরিয়ে তালবেড়িয়া গ্রাম। যাওয়ার পথে জীবনপুরে ঢুকে এই গ্রামটি না দেখলে দারিদ্র্যের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে তা বোঝা যেত না। গ্রামটির সমস্ত মানুষই সাঁওতাল। তালবেড়িয়া গ্রাম পেরিয়ে রাস্তাটি সুভাষ রোডে পড়েছে। বরাকর পুরুলিয়া রোড থেকে এই অঞ্চলের গ্রামগুলির মূল সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তা এই সুভাষ রোড। রাস্তাটি শেষ হয়েছে বাঁকুড়া- পুরুলিয়া পথে সাঁতুড়িতে। ১৯২৪ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু স্থানীয় রামচন্দ্রপুর আশ্রমে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে সভা করতে এসেছিলেন এই পথ ধরেই। সেদিনের মাটির পথ আজ আধুনিক পথ হয়ে তাঁর স্মৃতি ধরে রেখেছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় তালবেড়িয়া পেরিয়ে গ্রামের শেষে এসে দাঁড়িয়েছি। তালবেড়িয়ার এই জায়গাটি থেকে ছোট ছোট পাহাড়, টিলাগুলি খুব সুন্দর দেখায়। সামনের পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকাতে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে। এই পথ ধরে ব্লক অফিসের পাশ দিয়ে রাস্তাটি পোরোলি পাহাড়ের নীচ দিয়ে পোরোলি নামে একটি সাঁওতাল গ্রামের মধ্যে দিয়ে মুরাডি গ্রামে পড়েছে। এই পথ ধরে আমরা মুরাডি পাহাড়ের নীচ দিয়ে বড়ন্তি ড্যামে পৌঁছলাম।

বড়ন্তি ড্যাম থেকে সূর্যাস্তের সময় আকাশে হাজারো রঙের অপরূপ শোভা চিরদিন মনে থাকবে। প্রায় ৬-৭ কি.মি. হাঁটার পর সবাই মিলে ড্যামের ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি, হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে এলো। ফেরার পথে দূর থেকে বাজনার আওয়াজ কানে ভেসে এল। অন্ধকারের মধ্যেই লক্ষ্য করে দেখি একজন স্থানীয় মানুষ বিরাট একটি কালো রঙের টিউব কাঁধে ও হাতে জাল নিয়ে ড্যামে মাছ ধরতে নামছেন। সারা রাত ধরে মাছ ধরবেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম দূরে কোথাও সাঁওতাল বা ছৌ নাচের মহড়া চলছে।

www.amaderchhuti.com

পরদিন সকালে ঠিক সাতটার সময় দুটি টাটা সুমো এসে হাজির হল। গাড়ি আমাদের নিয়ে বড়ন্তি ড্যামের উপর দিয়ে রামচন্দ্রপুর-কিনাইডি-কোটালডি হয়ে সুভাষ রোডের শেষে বরাকর পুরুলিয়া রোডে পড়লো। সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে রঘুনাথপুর দিকে কিছুটা যাবার পর গোবাগের মোড়। গোবাগ মোড় থেকে পাকা রাস্তা ধরে পাঞ্চেৎ জলাধার দিকের যাবার পথে ৩ কি.মি. দূরে রাস্তার দক্ষিণে ও পঞ্চকোট পাহাড়ের পশ্চিম দিকে পাহাড় থেকে একটি জলধারা পড়ছে যার স্থানীয় নাম "হদহদি"। হদহদির ১০০ মিটার দূরে মূল রাস্তা থেকে একটি পথ পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করেছে। বহু কাল আগে তৈরি হওয়া পঞ্চকোট পাহাড়ের একটি চূড়াতে যাবার রাস্তাকে কিছু বছর আগে বন দপ্তর সংস্কার ও পুর্ননির্মাণ করেছিল। গাড়ি চলাচলের অনুপযুক্ত হলেও ট্রেকিং এর পক্ষে রাস্তাটি ভাল। পাহাড়ের চড়াই উতরাই পেরিয়ে একদিকে গভীর খাদ নিয়ে পঞ্চকোটের বৈচিত্র্যময় শাল, মহুয়া, কেন্দুর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তাটি ৭ কি.মি. দূরে শেষ হয়েছে। গাড়ি থেকে হদহদির কাছে নেমে সেই পথে আমাদের হাঁটা শুরু হল। আমরা যাব ৭ কি.মি. ট্রেক করে ২১০০ফুট উচ্চতায়। মূল রাস্তা থেকে বেশ কটি পায়ে চলা সুঁড়ি পথ পাহাড়ের এদিক ওদিক চলে গেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে রাস্তাটি বেশ চড়াই। চারদিকের জঙ্গলও পাতলা। রাস্তা যত এগোচ্ছে জঙ্গলের পরিবর্তনও চোখে পড়তে লাগল। সারি সারি শাল, বেল, হরিতকি, আমলকি, বহড়া, কেন্দু ও কত রকমের নাম না জানা গাছ। পাহাড়ের ঝোপ ঝাড়ে নানা ধরনের ফুল, বাতাসে তাদের বিচিত্র গন্ধ। একদিকে চড়াই পথ অপরদিকে গভীর খাদ। ২ কি.মি. যাবার পর উপর থেকে সমস্ত কিছু পরিস্কার দেখা যেতে লাগলো। গ্রামগুলো ছোট ছোট দেশলাই বাক্সের মত। তার মাঝে মাঝে রাস্তাগুলো সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে। দূরে ঐতিহাসিক শেরগড়ের জঙ্গল আজকের আধুনিক আসানসোল ও বার্ণপুর শহর। কারখানাগুলিতে নানা রকমের ধোঁয়া উঠছে। অপরদিকে জৈন যুগের বিক্রমাদিত্যের প্রিয় জায়গা তেলকুপি দখল করে নেওয়া পাঞ্চেৎ জলাধারের জলরাশি। সবই যেন কোন শিল্পীর তুলির টানে আঁকা জীবন্ত এক পট। ভাবলাম মনের মধ্যেকার ইতিহাসের জুম দিয়ে যে ছবি দুচোখ ভরে দেখছি সে ছবি ক্যামেরা বন্দি করব কেমন করে? কখন যে ৬ কি.মি. পথ পেরিয়ে এসেছি তা বুঝতেই পারিনি। তাকিয়ে দেখি পূর্ব-দক্ষিণ কোন বরাবর ২২০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পঞ্চকোটের চূড়া দেখা যাচ্ছে। মূল রাস্তা থেকে পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে উঠে দেড়শো ফুট হেঁটে যাবার পর দেখা গেলো তিনশো স্কোয়ার ফুট বিশিষ্ট একটি প্রায় সমতল হয়ে যাওয়া জায়গা যেটির চারদিক পাড় দিয়ে বাঁধানো। এটি অতীতের নপকরা বা নপুকুর। জনশ্রুতি এই পুকুরে আগে নীল পদ্ম জন্মাতো। পুকুরের দক্ষিণ দিকের সমতল জমিতে দুষ্প্রাপ্য ভেষজ চাষ করা হত। পঞ্চকোট রাজারা আয়ুর্বেদের উন্নয়নে এখানে বহু পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছেন। সারা দেশ থেকে এই চর্চার জন্য বৈদ্যদের আনা হয়েছিল। আজও বহু দুস্প্রাপ্য ভেষজ এই পাহাড়ে পাওয়া যায়। সেইসময় পুকুরটিতে সারা বছর জল থাকতো। এখন পাঁকে মজে গেছে। উত্তর দিকের পুকুর পাড়ে এক নাম না জানা সাধু প্রায় ৭০-৮০ বছর আগে ডেরা বেঁধেছিলেন। সাধনপীঠের ছাইভষ্ম এখনও সেখানে পড়ে আছে। জায়গাটিকে সাধুর ডেরা বলা হয়। পাহাড়ের এই অঞ্চলটিতে বছরে বেশ কিছু সময় মেঘ জমে থাকে। ফলে এখানকার জলবায়ু পাহাড়ের অন্য স্থানের থেকে একটু অন্যরকম। মাঝে মাঝে দার্জিলিং এর ম্যালের মত মেঘ উড়ে যাচ্ছে। তবে মেঘের এই খেলা বর্ষা কালেই বেশী দেখা যায়। দেখতে দেখতে আমরা রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম।

এখানে পর্যটকদের বসার জন্য বন দপ্তরের তৈরি একটি গোল চালা দেওয়া কংক্রিটের চারদিক খোলা ঘর রয়েছে। এখান থেকে চারদিক ঠিক যেন ছবির মত। ইতিহাস ঢাকা পড়েছে বর্তমানের চাদরে। পুরনো দিনের শেরগড়ের জঙ্গল আর নেই যেখান থেকে শেরসাহ বঙ্গ বিজয় শুরু করেছিলেন। ভয়াল ভয়ঙ্কর দামোদর, বরাকর বাঁধা পড়েছে পাঞ্চেৎ মাইথনে। পাহাড়ের নীচে, মাটির ওপর আর তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে ৮১০ বছর ধরে গড়ে ওঠা পঞ্চকোট রাজ্যের রাজধানী। এক সময় হাতি শালে হাতি ছিল, ঘোড়া শালে ছিল ঘোড়া। মন্দিরগুলিতে সন্ধ্যার আরতি হত। মল্লিকবাজার গমগম করতো প্রজাদের আনাগোনায়। গড় থেকে সৈন্য বাহিনী ছুটে যেত শত্রু মোকাবিলায়। আজ সে রাজধানী জঙ্গলে ভরা তেপান্তরের মাঠ। তবু আধুনিকতা চেষ্টা করেও এখনও ধ্বংস করতে পারেনি পঞ্চকোট পাহাড়কে। জঙ্গলে গাছেরা আছে, পশুরা ঘুরে বেড়ায়, ডালে ডালে পাখিরা গান গেয়ে বেড়ায়। মরশুমে পাতা ঝরে আবার নতুন পাতা হয়-ফুলে ফলে ভরে থাকে চারিদিক। এই খরাপ্রবণ জেলায় মানুষের দারিদ্র্য কিম্বা অপরিকল্পিত ভাবে পাহাড়ের তলায় তৈরি হওয়া স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার কালো ধোঁয়া ও হাজারো দূষণ এখনও পারেনি এই পাহাড়কে শেষ করতে। আমরা যখন বাঁধানো জায়গাটাতে খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে নানা কথা বলছি ও ভাবছি সেই সময় হঠাৎ তলায় মেঘ জমে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা মেঘের ওপর থেকে মেঘনাদ হয়ে সে দৃশ্য দেখলাম।

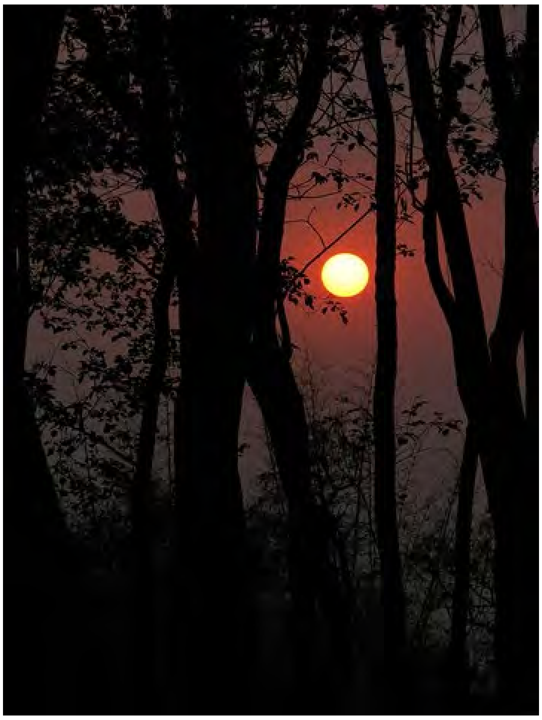

প্রায় দেড়শো বছর আগে হয়তো এখানে বসেই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পঞ্চকোট পাহাড়ের মেঘের খেলা দেখে তাঁর "পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী" কবিতায় লিখেছিলেন,

'হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে,
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে-
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে-
আলো করি দশ দিশ, হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।....'

~ বড়ন্তি-পঞ্চকোটের তথ্য ~ বড়ন্তির আরো ছবি - সিন্টু ভট্টাচার্য ~

Rate This : - select -
Total Votes : 12
Average : 3.42

Like 3 people like this.

tell a Friend

Post Comments

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

সান্দাকফু – চেনা পথে ফিরে আসার গল্প

মাহমুদ ফারুক

সান্দাকফু-ফালুট ট্রেক রুট ম্যাপ || সান্দাকফুর তথ্য
ট্রেকের ছবি - মাহমুদ ফারুক ~ ট্রেকের আরো ছবি

সান্দাকফু নামটি সর্বপ্রথম শুনেছিলাম আমার ট্রেকিং গুরু আনোয়ার ভাই-এর মুখে। উনার কাছ থেকে শুনে শুনে আর অবসর সময়ে গুগলে ম্যাপ দেখে কিছু কিছু জায়গার নামও প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে টার্গেট করে রেখেছিলাম ২০১২তেই সান্দাকফু ভ্রমণ করব। শেষপর্যন্ত তা সত্যিই করতে পারলাম – একবার নয়, একবছরের মধ্যেই দু-দুবার ঘুরে এলাম সান্দাকফু থেকে!

সান্দাকফু-র ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বড় যে আবেগ কাজ করেছিল তা হল জীবনে প্রথম ১২০০০ ফিট উচ্চতায় আরোহণ এবং নিজের চোখে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং এভারেস্টের চূড়া দেখা। প্রথমবারে সঙ্গী ছিল আমার এক ট্রেকিং বন্ধু মাহবুব রুবেল। কিন্তু সেবারে কুয়াশা আর খারাপ আবহাওয়ার জন্য অনেক কিছুই দেখতে পাইনি। প্রথমবার সান্দাকফু ভ্রমণ শেষ করেই রুবেল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবছরের শেষে আমরা আবার সান্দাকফু যাব। শেষপর্যন্ত ২৮শে অক্টোবর রাতে আমরা রওনা দিলাম। তবে রুবেলভাই যেতে না পারায় মনটা বেশ খারাপ।

দিলীপদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল প্রথমবারে শিলিগুড়ি পৌঁছে। মানেভঞ্জন যাওয়ার জন্য ২৭০০ টাকায় একটা গাড়ি রিজার্ভ করে দিয়েছিলেন উনি।এবারেও শিলিগুড়ি পৌঁছে সোজা দিলীপদাকেই খুঁজলাম মানেভঞ্জন যাবার গাড়ি রিজার্ভেশানের জন্য। আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন। এবার উনি ২৫০০ টাকায় একটি টাটা সুমোর ব্যবস্থা করে দিলেন আমাদের।

গতবারে আমরা যেদিন মানেভঞ্জনের উদ্দেশ্যে রওনা দিই,সেদিন ছিল ২৬শে মার্চ। শিলিগুড়ির রাস্তা ধরে কিছুদুর যাবার পরে মিরিক, শুকিয়াপোখারি হয়ে মানেভঞ্জন। আমরা একটু একটু করে উচ্চতায় আরোহণ করছি। পাহাড়ি বাঁকগুলো ঘোরার সময় একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হচ্ছিল।

মিরিক লেক

এবারে সেই চেনা রাস্তা আর চেনা স্মৃতি দিয়ে আবার যেতে যেতে আমার যে কী পরিমাণ আনন্দ হচ্ছিল তা বলে বোঝাবার নয়। সেই ক্যান্টমেন্টের ভিতর দিয়ে রাস্তা, সেই পরিচিত পাথুরে নদী। যাবার সময় একটা বিড়ালকে রাস্তা পার হতে দেখে আমাদের ড্রাইভার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে একটুক্ষণ বসে রইল। এবারের ড্রাইভার নিখাদ বাঙালি আর আগের ড্রাইভার ছিলেন নেপালি, বাংলা বলতে আর বুঝতে একটু আটকে যেতেন। যাই হোক বিড়ালকে গার্ড অফ অনার দিয়ে আমরা পর্বতের ঢাল বেয়ে উঠা শুরু করলাম। চা বাগানের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলছে সঙ্গে নস্টালজিক গান – আহ্ এই অনুভূতি বলে বোঝাবার নয়। সবাই মিলে কোরাস গাইতে গাইতে ঘন পাইন বন আর চা বাগানের ভিতর দিয়ে মিরিক পৌঁছে গেলাম।

গতবার আমরা মিরিকে মিনিট পনের-কুড়ি থেমেছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল মিরিকে আর একবার আসতেই হবে, জায়গাটা খুবই সুন্দর। মিরিকে একটি খুব সুন্দর লেক আছে তার ওপারে বনভূমি। কিন্তু এবারে মিরিক এসে পুরাই হতবাক হলাম – মিরিক লেকের মাঠটায় বোধয় কোন অনুষ্ঠান হয়েছিল – চেয়ার প্যান্ডেল আর ধুলা বালুতে সব একাকার আর খালি ট্যুরিস্ট আর ট্যুরিস্ট - পুরো এলাকা গিজ গিজ করছে। চা খেয়ে, মুড়ি ভর্তা নিয়ে আবার গাড়িতে উঠে পড়লাম।

মানেভঞ্জন

এখান থেকে আমরা ধীরে ধীরে আরো ওপরে উঠে চা বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে সন্ধের মধ্যেই মানেভঞ্জন পৌঁছেছিলাম। মানেভঞ্জনের উচ্চতা ২১৫০ মিটার বা ৭০৫৪ ফিট আর শিলিগুড়ির উচ্চতা ছিল ১২২ মিটার/৪০০ ফিট - অর্থাৎ প্রথম দফাতেই আমরা প্রায় ২০২৮ মিটার বা ৬৬৫৪ ফিট উঠে এসেছিলাম। এর আগে আমি কখনও এত উচ্চতায় উঠিনি। আমরা মানেভঞ্জনের ‘জীবন চিত্রে’-র হোটেল এক্সোটিকা খুঁজে ওখানে গিয়ে উঠেছিলাম। সান্দাকফু ট্রেকিং-এর আগে ইন্টারনেটে সার্চ করে যত ব্লগ আর ফোরাম দেখেছিলাম সবাই এর কাছেই যাবারই পরামর্শ দিয়েছে। কারণটা একটু পরেই বুঝতে পেরেছিলাম।একে উচ্চতার জন্য শারীরিক কষ্ট তায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। জীবনদাদার আন্তরিকতায় সবকিছু ভুলে গেলাম। জীবনদাদা ও তার সহধর্মিনী আমাদের এমন আতিথেয়তা দিলেন যেন মনে হল আমার কোন খালার বাসায় বেড়াতে এসেছি।

এবারের গল্পটা কিন্তু বেশ আতঙ্কেরই। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার আবছায়া আর চাঁদের সোডিয়াম আলোতে মনে হচ্ছিল আমরা যেন অনন্ত পথ ধরে চলছি। গান শুনতে শুনতে অন্যদের মতো আমিও কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই কিন্তু সুকিয়াপোখরিতে এসে ড্রাইভার যখন আশে পাশের মানুষকে জিজ্ঞেস করা শুরু করল মানেভঞ্জনের রাস্তা কোনদিকে তখন বুঝলাম এই বান্দা কখনও মানেভঞ্জন আসেনি, ঘুম উবে গেল। কাউকে কিছু বুঝতে দিলাম না, গাড়ি গাড়ির মত চলছে ত চলছেই, মাঝে মাঝে দেখি ড্রাইভার লাইট দিয়ে তেলের লেভেল দেখছে। একসময় সে পুরোপুরি সন্দিহান হয়ে আমাকেই জিজ্ঞেস করল যে এটাই মানেভঞ্জনের রাস্তা কি না, আমি বললাম সুকিয়া থেকে বামে এই একটাই রাস্তা আর সেটা সোজা মানেভঞ্জন দিয়েই গিয়েছে – কিন্ত রাস্তার অবস্থা এত খারাপ কিছু কিছু জায়গায় যে আমি নিজেই সন্দিহান হয়ে উঠছিলাম ঠিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি কিনা। অন্ধকারে যা হয় – হাল্কা আতঙ্ক এসে ভর করে এবং তখন নিজের ডাইনিংরুমও ক্যাসেল ট্রান্সসিলভেনিয়া হয়ে যায়!

সন্দেহ – আতঙ্ক আর তেলের লেভেল দেখতে দেখতে দুশ্চিন্তার প্রায় চরম পর্যায়ে এসে আমরা শেষপর্যন্ত মানেভঞ্জন পৌঁছুলাম। আহ্ আবার সেই হোটেল এক্সোটিকা – দৌড়ে ওপরে উঠলাম জীবনদার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

জীবনদা-ও আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন এবং সাথে সাথেই বললেন যে আমাদের ‘দিদি’ গিয়েছেন শিলিগুড়ি বেড়াতে। এর একটাই অর্থ যে রাতে ডিনার বাইরে করতে হবে। এখানকার লোকাল রেস্টুরেন্টগুলো সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যায় সেখানে পৌনে আটটাতো গভীর রাত। নীচের দোকান থেকে চকলেট আর বাদাম কিনলাম। রুমে এসে বললাম আজ এগুলো দিয়েই আমাদের ডিনার সারতে হবে। হঠাৎ দেখি হুড়মুড়িয়ে চেনা একটা দল এসে ঢুকল হোটেলে – নয়ন ভাই-এর গ্রুপ।

বাংলাদেশেই নয়ন ভাই-এর সাথে পরিচয়। উনি বলেছিলেন যে উনারা যাবেন ১৮ তারিখে। আমাদেরও যেতে বলেছিলেন ওঁদের সঙ্গে। আমি বাংলাদেশ থেকেই জীবনদার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমরা যদি ৩১ তারিখে সান্দাকফু উঠি তাহলে সমস্যা হবে না। প্রতি বছর এই সময় একটি ট্রাভেল গ্রুপ দৌড়ে সান্দাকফু উঠা আর নামার একটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট করে। এর জন্য ওরা পথের সব লজ অগ্রিম বুকিং করে ফেলে। ফলে

সাধারণ ট্যুরিস্টদের থাকার চরম সমস্যা হয়। নয়ন ভাইকেও ব্যাপারটা জীবনদা বলেছিলেন কিন্তু নয়নভাইয়ের কিছু করার ছিল না, ছুটি নিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছিল তাই 'যা আছে কপালে' টাইপের অবস্থা মাথায় নিয়েই গিয়েছিলেন। উনাদের কাছে শুনলাম ট্রেকিং করে উনারা সান্দাকফু উঠে কোন কটেজে থাকার যায়গা পাননি - কোনমতে অভিশাপ দিতে দিতে আর প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে নাকি রাত পার করেছেন এবং পরেরদিন গাড়ি নিয়ে সোজা এখানে।

রাতের খাবারের একটা ক্ষীণ আশায় আবার জীবনদার কাছে গিয়ে দেখি উনি আমাদের জন্য আলু ভর্তা, ভাত আর ডিম ভাজি করছেন। আহ, সাথে সাথে সব্বাইকে ডেকে জীবনদার ডাইনিং-এ জম্পেশ করে ভাত-ডাল-আলুভর্তা-ঘি দিয়ে ডিনার শেষ করলাম।

গতবারে আমাদের জন্য জীবনদা যে গাইড ঠিক করেছিলেন তার নাম ছিল 'নিমাহ', বছর বিয়াল্লিশ বয়স, বেশ কয়েকবার সান্দাকফু-ফালুট ট্রেকিং-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। বেরোনোর দিন সকালে জীবনদাদার ম্যাজিক দেখেছিলাম,উনি হাতে হাতে একটি ম্যাপ এঁকে দিয়েছিলেন - প্রতিটি শর্টকাটের চিহ্নিত করা

মানেভঞ্জন

এবং সঠিক দূরত্ব পরিমাপ করে দেওয়া। সেই ম্যাপ এবারেও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। উনি সেবারে আমাদের মেঘমা থেকে জৌবাড়ি হয়ে তুমলিং যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এবারে খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়ে আমাদের হোটেলের ঠিক উল্টা দিকের একটা রেস্টুরেন্ট থেকে রুটি, আলুর দম আর ডিম দিয়ে নাস্তা করে নিলাম। দ্বিতীয়বার ট্রেকিং-এর অভিজ্ঞতা থেকে পাঠককে বলছি যে অবশ্যই মানেভঞ্জন থেকে ভরপেট নাস্তা করে যাবেন। এরপরে আর কোথাও রেডিমেড নাস্তা পাবেন না। আর কিছু খেতে গেলে রান্না করার সময় পর্যন্ত আপনাকে বসে থাকতে হবে যা স্রেফ সময়ের অপচয়!

খেয়ে দেয়ে চিত্রের দিকে হাটা শুরু করলাম, চিত্রের দিকে যে রাস্তাটা উঠে গিয়েছে সেখানে একটি তিন রাস্তার মোড় রয়েছে, অনেকটা Y জংশান টাইপের - একটি মানেভঞ্জনের দিকে, একটি চিত্রের দিকে আর একটি রাম্মাম থেকে গুরদুম হয়ে মানেভঞ্জনের সঙ্গে মিশেছে। এই মোড়েই রয়েছে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের চেকপোস্ট। এখান থেকেই টিকেট কিনে নিতে হয়।

চিত্রে মনাস্ট্রি

www.amaderchhuti.com

আমাদের আগের বারের গাইড 'নিমাহ' এবার অন্য গ্রুপের সঙ্গে ট্যুর করছে। গাইড অ্যাসোসিয়েশান আমাদের একটি অল্পবয়সী গাইড দিল, বয়স খুব বেশি হলে ১৪-১৬, সাথে কোন মোবাইল নেই, ঘড়িও নেই। আমি অবশ্য এতে ঘাবড়াইনি - রাস্তা যেহেতু চিনিই তাই নিয়ম রক্ষার জন্য এই গাইড নেওয়া। বাকি সব গাইড নাকি সেই ম্যারাথন প্রতিযোগিতার সঙ্গে রয়েছে।

চিত্রে

সান্দাকফু ট্যুরের সবচেয়ে নয়নাভিরাম পথ হচ্ছে মানেভঞ্জন থেকে চিত্রে যাবার রাস্তা। ২৫০০ মিটার/৮২০২ ফিট - মানেভঞ্জন থেকে প্রায় ৪০০মিটার/ ১৩১২ ফিট ওপরে - মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি যেন হলিউডের কোন মুভির সেটের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। জায়গাটা এত বেশি সুন্দর যে ভাষা অথবা ছবি কিছু দিয়েই এর বর্ণনা করা যাবে না। ঘন পাইন বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে উঠে গিয়েছে পিচে ঢালা পথ। উপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ ইরাজ ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন উত্তরে পিছনে যেই বরফওয়ালা পর্বতটা দেখা যাচ্ছে সেটিই কাঞ্চনজঙ্ঘা কিনা? আমি তাকিয়ে একেবারে হতবাক! মার্চের ট্যুরে একমাত্র সান্দাকফু থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিলাম তাই বিস্ময়ে স্রেফ বোবা হয়ে গেলাম। সত্যি আমি রাস্তার সেই কোণায় স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে দেখছি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে! বাকিরা দেখি আমাকে রেখে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। চিত্রে পর্যন্ত যাওয়া তো দূরে থাক, চিত্রে উঠার রাস্তা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে এটা তাদের মোটেই বিচলিত করছে না, যেহেতু এরা প্রথম এলো তাই হয়ত মনে করছে এইটাই স্বাভাবিক! আর আমি চিন্তা করছি মার্চে আমি আর রুবেল ভাই রাস্তায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাতো দূরের কথা দশফিট দূরের কিছুই দেখতে পারছিলাম না কুয়াশার জন্য।

গতবারে চিত্রে পৌঁছেই যেটা সবার আগে চোখে পড়েছিল যে এখানে একটি বিরাট বৌদ্ধ মনাস্ট্রি রয়েছে। মনাস্ট্রির ভিতর দিয়ে গিয়ে আমরা একটা ট্রেকার্স লজে গিয়ে উঠেছিলাম। এখানকার ট্রেকার্স লজগুলো একাধারে রেস্ট হাউজ, ট্রেকার্স লজ এবং রেস্টুরেন্ট। এখানকার মজার বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন খাবার অর্ডার দিব ঠিক তখনই রান্না শুরু হবে আর একদম ফ্রেশ খাবার পাওয়া যাবে। সেবারে দোলমা দিদির লজে আমরা কফি খেয়েছিলাম। এখানেই পরিচয় হয়েছিল দুই জার্মান ভদ্রলোকের সাথে, দুজনের বয়স আনুমানিক আমি ধরেছিলাম সত্তরের কাছাকাছি - পরবর্তীতে 'মেঘমা'তে গিয়ে পাসপোর্ট দেখানোর সময় একজন বলল তার জন্ম ১৯৩৩ সালে - শুনে এস.এস.বি-র দায়িত্বরত কর্মকর্তারও চোখ কপালে উঠেছিল।

এবারে চিত্রে পৌঁছে পুরা মনাস্ট্রি চক্কর দিয়ে সেই দোলমা দিদির লজে গিয়েই উঠলাম। মজার বিষয় হচ্ছে এই লজে আমাদের যাদের সাথে দেখা হয় তাদের সাথেই ট্যুর শেষ হয় ... গতবার তাই হয়েছিল, কে জানত যে এবারও তাই হবে!

লামেধুরা

গতবারে চিত্রে থেকে আমি আর রুবেল ভাই আর সেই দুই জার্মান মিলে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য লামেধুরার দিকে একসঙ্গেই বেরিয়েছিলাম। যাবার পথে সেবারে আমরা একটা শর্টকাট নিলাম। এখানেই আমার একটু কষ্ট হয়েছিল। ২৬০০ মিটারের বেশি ওপরে বাতাসের অক্সিজেন পরিমাণ হয়ত কম - বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছি কিন্তু ফুসফুস ভরছেনা, একটু বমিবমি আর দুর্বলও লাগছিল - একদম পার্ফেক্ট অলটিচিউড সিকনেস-এর লক্ষণ। মন দিয়ে শরীরের উপরে জোর খাটিয়েছিলাম, প্রিয় গানগুলো মোবাইলে লাউড স্পিকারে চালিয়ে আস্তে আস্তে একটু একটু করে উঠছিলাম। লামেধুরার একটু আগে গিয়ে রুবেলভাই আর জার্মানদের দেখা পেয়েছিলাম,ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।এরপর অবশ্য সিকনেসটা চলে গিয়েছিল এবং সাবলীলভাবেই ট্রেকিং করেছিলাম।

এবারে নিজে ভুক্তভোগী না হলেও অসুস্থ সঙ্গীকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেও আবারও এযাত্রায় পিছিয়ে পড়লাম।

মেঘমা

২৬০০ মিটার/৮৫৩০ ফিট। মেঘমা যাবার রাস্তায় অনেকগুলো শর্টকাট আছে, এই শর্টকাটগুলো প্রধান গাড়ি চলার রাস্তাকে ঘিরেই। মেঘমা নাম দেওয়ার কারণটা গতবার সেখানে পৌঁছেই বুঝেছিলাম, একেবারে মেঘের ভিতরে আমরা ট্রেকিং করছি এবং ১০ ফিট দূরত্বের বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এবারে প্রায় কোন ঝামেলা ছাড়াই আমারা লামেধুরা থেকে মেঘমা পৌঁছুলাম। গত মার্চে এখানে কুয়াশার জন্য ১০ ফিট দুরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন তংলুর মাথার ওপরে নীল আকাশ।

মেঘমা থেকে তুমলিং যাবার দুটো রাস্তা আছে, একটা তংলু হয়ে তুমলিং আর একটা জৌবাড়ি হয়ে তুমলিং - তংলুর উচ্চতা ৩০৭০ মিটার এবং কেউ কেউ বলেন এখান থেকে কাঞ্চনজজ্ঞা আর এভারেস্ট সান্দাকফুর চাইতেও নাকি ভালো দেখা যায়। মনে হচ্ছিল তংলুর রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠে যাই, কিন্ত দলের দুজনের পায়ের অবস্থা চিন্তা করে মনের ইচ্ছে মনেই রেখে দিলাম। তংলুর রাস্তাটা খুব সুন্দর - এঁকে বেঁকে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া।

তুমলিং

২৯৭০ মিটার/৯৭৪৪ ফিট। গতবারে মেঘমা থেকে জৌবাড়ি যাবার পথে মেঘ এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে লেন্সে ফাংগাস পড়ে যাবার ভয়ে আর ক্যামেরা বের করা যায়নি। সেবারে আগে থেকে এটাও প্ল্যান করেছিলাম যে এখানেই আমরা রাত কাটাব। অর্থাৎ ২৬শে মার্চ মানেভঞ্জন, ২৭শে মার্চ তুমলিং। কিন্ত পৌঁছে দিনের আলো দেখে ২৬২১ মিটারে অবস্থিত গাইরিবাস-এ নেমে গিয়েছিলাম।

এবারেও মেঘমা থেকে নির্বিঘ্নে তুমলিং পর্যন্ত এলাম, এখানে শিখর লজের বাইরে পাতা একটি বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার গাইরিবাসের দিকে যাত্রা।

গাইরিবাস

তুমলিং ছেড়ে কিছুদূর যাবার পর আবার সেই কাঞ্চনজজ্ঞা। দেখতে দেখতে আর ছবি তুলতে তুলতে হেঁটে যাওয়া। বিকালের রোদটা খুবই মিষ্টি লাগছিল কিন্তু

কালপোখরি থেকে দেখা সান্দাকফু

আশঙ্কা হচ্ছিল দিনের আলো থাকতে থাকতে হয়ত গাইরিবাস পৌঁছাতে পারব না। গাইরিবাসের ঠিক আগে একটি টাওয়ারওলা সেটেলমেন্ট আছে - নামটা ঠিক মনে নেই। এখানে মার্চে যখন এসেছিলাম তখন ছিল ঘন কুয়াশা, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না আর এবার পুরো উপত্যকাটাই ভাল করে দেখতে পেলাম। এখানে একটু জিরিয়ে নিতেই দেখি সূর্য ডুবে গিয়ে লালিমা ছড়াচ্ছে।
সন্ধ্যায় গাইরিবাস নামাটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল - এক অন্ধকার, যদিও টর্চ ছিল আর দুই এই রাস্তার পাথরগুলো সব ছড়ানো ছিটানো এবং পাড়া দিলেই গড়াগড়ি খায় যেটা পা মচকে যাবার জন্য যথেষ্ট। আমি মনে করেছিলাম ভরা পূর্ণিমায় চাঁদের আলোতে ট্রেকিং করব। কিন্তু প্ল্যানে একটু ভুল ছিল - চাঁদ উঠে পুব দিক থেকে আর আমরা যাচ্ছি পশ্চিমে এবং একটি পর্বতের ঢাল বেয়ে পর্বতটাকে ডান দিকে রেখে। যার কারণে একটু পরে দেখলাম জোছনায় পুরা উপত্যকা ভেসে যাচ্ছে কিন্ত আমরাই একমাত্র অন্ধকারে - আমরা আছি পর্বতের চূড়ার ঢালে, ছায়াতে!
গতবারে গাইরিবাসে পরদিন সকালে কতগুলো পাহাড়ি কুকুরের সাথে ভাব হয়েছিল - দেখতে পুরা ভয়ঙ্কর সাইবেরিয়ান নেকড়ের মত কিন্তু আন্তরিকতায় একদম ট্যুরিস্ট ভক্ত। আপনার সাথে সাথে হাঁটবে, খেতে দিলে খাবে, মনে হবে যেন কতদিনের পরিচয়। এবারেও ওদের সঙ্গে দেখা হল।

কাইয়াকাঠা

গাইরিবাস ২৬২১ মিটার থেকে খাড়া ৪০০ মিটার উঠে কাইয়াকাঠা। এই উঠার পথেই প্রথম দেখি রডোডেন্ড্রনের প্রাকৃতিক বাগান, ঝাঁকে ঝাঁকে রডোডেন্ড্রন ফুল।

কালাপোখারি

৩১৮৬ মিটার/ ১০৪৫২ ফিট। কাইয়াকাঠা থেকে কালাপোখারির রাস্তাটাই বোধহয় গোটা ট্যুরে সবচাইতে ভাল রাস্তা। পুরোটাই সমতল এবং উঠানামা খুবই সামান্য।সেবারে কালাপোখারি পৌঁছে আমরা প্রথমে এস এস বি ক্যাম্পে চেক ইন করে নিয়েছিলাম। এখানেও বেশ কিছু ট্রেকারস লজ আছে। গাইডের পছন্দের একটি ট্রেকার্স লজে উঠে রান্না শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে আছি, এস.এস.বি. থেকে একজন এসে আমাদের সাথে আলাপ করলেন। তিনি এস.এস.বি.-তে জয়েন করার আগে পরে ২৪ পরগনা থেকে বর্ডার ক্রস করে বাংলাদেশে যাত্রা পুজো ইত্যাদি অনুষ্ঠান দেখতে চলে আসার কাহিনি শোনালেন। এশিয়া কাপে ওঁরা নাকি বাংলাদেশকে সাপোর্ট করেছিলেন এবং আমাদের সাথে খেলার শেষে ওঁরাও নাকি কেঁদেছিলেন - ঠিক একই কথা অবশ্য বলেছিলেন মানেভঞ্জনের এস.এস.বি.-তে যিনি প্রথম আমাদের নাম এন্ট্রি করেন। এঁরা সবাই খুব আন্তরিক। এখানকার থাকার ব্যবস্থা অসাধারণ এবং সেই আবার প্ল্যান করেছিলাম যে পরবর্তীতে গাইরিবাস না থেকে এখানেই চলে আসব। কিন্তু এবারেও কালাপোখরিতে থাকা হল না, শ্রেফ একটু চা খেয়ে বিকেভঞ্জনের দিকে রওনা দিলাম।

বিকেভঞ্জন

৩৩৫০ মিটার/১০৯৯১ ফিট। বিকেভঞ্জন থেকে সান্দাকফুর তিনটি রাস্তা রয়েছে - একটি নেপাল হয়ে,একটি গাড়ির রাস্তা আর একটি হচ্ছে গাড়ির রাস্তার মাঝে কৌণিক দূরত্বের শর্টকাট। আমরা গাড়ির রাস্তা দিয়েই হাঁটা শুরু করলাম। এই রাস্তাটা অনেকটা জায়গায় খাড়া উঠে গেলেও চওড়া অর্থাৎ গাড়ি চলার মত প্রশস্ত হওয়ায় মনস্তাত্তিক ভাবে একটু নিরাপদ।

সান্দাকফু

৩৬৩৬ মিটার/১১৯২৯ ফিট। গতবারে বিকেভঞ্জন থেকে খাড়া উঠতে উঠতে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম আর ক্ষণে ক্ষণে দেখছিলাম সান্দাকফু দেখা যায় কি না। শেষপর্যন্ত যখন সান্দাকফুর ট্রেকার্স লজের মাথাটা চোখে পড়ল তখন নিমাহকে ডেকে বললাম এর জন্যই এত কষ্ট করে আসা।
এই সেই স্বপ্নের সান্দাকফু!! ...সান্দাকফু উঠেই আমার প্রথমবার অনুভূতি ছিল এটাই।

www.amaderchhuti.com

কাঞ্চনজঙ্ঘা - সান্দাকফু থেকে

আমি যেন ডিপ-ফ্রিজের দরজা খুললাম এবং ১৮০ কিমি বেগে সেই ফ্রিজের ঠাণ্ডা বাতাস আমার উপরে বয়ে যাচ্ছিল! কিন্ত কী আশ্চর্য সব কিছু অগ্রাহ্য করে সান্দাকফুর চূড়ায় উঠা শুরু করেছিলাম। দুচোখ দিয়ে খুঁজেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্ট। কিন্তু সেবারে আবহাওয়া এতটাই খারাপ ছিল যে তিরিশ সেকেন্ড পর পর মেঘ আর কুয়াশা এসে দৃষ্টিসীমা ঢেকে দিচ্ছিল।
এবারে সান্দাকফুর চূড়ায় পৌঁছে দেখলাম মার্চে যেই লজে উঠেছিলাম সরকারি সি ক্যাটাগরির ঠিক সেই লজটিতেই গাইড নিয়ে গেল। চেনা কিচেনে ঢুকে কেয়ারটেকারকে হিন্দি-ইংরেজিতে বলতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে লোকটা বলল হ্যাঁ, আপনি নিমার সাথে এসেছিলেন। আর তার বউ বলল আপনি না আমাদের ছবি তুলেছিলেন সেই ছবি কৈ? যাঃ...আমিতো ভুলেই গিয়েছিলাম ... ছবি তো আনা হয়নি! লজ্জায় পরে এই-ওই বলে কাটিয়ে তাদের সাথে মোমো খেতে খেতে আড্ডায় মশগুল হয়ে গেলাম।
একটুপরে বাইরে বেরিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্টের লালিমার ছবি তুলতে শুরু করলাম। এখানে একটি মজার বিষয় না বললেই নয়, যে ফরাসী মহিলাকে চিত্রেতে দেখেছিলাম পরে লামেধুরাতে তাকে আমরা পেয়েছি। মেঘমাতে খানিক আলাপও হয়েছিল। এর পরে তাকে আমরা আমাদের ক্রস করতে দেখিনি কিন্তু সান্দাকফুতে সূর্যাস্তের ছবি তোলার সময় দেখি সে এসে হাজির। ট্রেকিং-এ পরিচয়ে কুশল বিনিময়ের এক অদ্ভুত আনন্দ আছে সেটা যারা গিয়েছেন তারা জানেন। ইজরায়েলি একটি দলের সাথে সে এসেছে। সান্দাকফুতে পা দিয়েই রমাকান্তদার সঙ্গে পরিচয় হল। সুন্দর বিকেলটা কাটালাম রমাকান্তদার টিম আর বিদেশি আরও কিছু ট্রেকারদের সাথে। মজার বিষয় হচ্ছে মার্চে ঠাণ্ডার চোটে যেখানে দাঁড়িয়েই থাকতে পারছিলাম না সেখানে এখন ছবি তুলছি খালি হাতে আর সানন্দে আড্ডাও দিচ্ছি। সূর্য ডুবে যাওয়ায় পুরো আকাশটা লাল হয়ে কী এক অদ্ভুত অনুভূতি এনে দিচ্ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।
হঠাৎ শুভ ভাই এসে বললেন যে, যে কারণে ট্রাইপডটা ক্যারি করেছি সেটার সদ্ব্যবহার করতে, অর্থাৎ রাতে সান্দাকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি তুলতে। ট্রাইপড আর ক্যামেরা নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। যেখান থেকে ছবি তোলার প্ল্যান করছি ঠিক সেখানেই দেখি রমাকান্তদারা দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রাইপড সেই মার্চেও নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু তখন বিকেলেই যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাইনি সেখানে রাতে দেখা অবান্তর। প্ল্যান করেছিলাম এবারও সুযোগ নিব এবং সৌভাগ্য যে চিত্রে থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল আর সান্দাকফুতেতো রাতেও খালি চোখে দেখা যাচ্ছে কারণ আকাশ ভরা জোছনা। জায়গা মত ট্রাইপড সেট করে ম্যানুয়াল ফোকাস অ্যাডজাস্ট শুরু করলাম কিন্ত ঠাণ্ডায় সব কিছু জমে যাচ্ছিল - গ্লাভস থেকে হাতই বের করা যাচ্ছিল না, কয়েকটা স্ন্যাপ নেবার পরে ঠাণ্ডায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি এমন সময় রমাকন্তদা আসলেন। আমাকে ইন্সপায়ার করলেন আর সাথে কেউ থাকলে সাহস একটু বেড়ে যায় বইকি। আবার ছবি তোলা শুরু করলাম। যেহেতু ম্যানুয়াল ফোকাস তাই পুরা আন্দাজের ওপরে ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে ফোকাস করছি। আন্দাজের উপরে প্রিভিউ দেখতে দেখতে তেইশ নাম্বার ছবিটাতে শার্পনেস পেলাম। ততক্ষণে আমাদের হাত পা সব বরফ হয়ে গিয়েছে। যদিও ছবিটা আমার ক্যামেরায় তোলা কিন্তু সেই ছবিটার আনন্দ সেখানে সবাই মিলে দারুণ উপভোগ করলাম।
খুব ভোরে উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্টের চূড়ায় সূর্যোদয়ের লাল কমলা রঙ লাগার অপরূপ ছবি তুলে নিলাম। মনে পড়ছিল প্রথমবারের অভিজ্ঞতার সেই অসাধারণ স্মৃতি। সেবারে পরদিন সকালে গাইড এসে ডেকে দেওয়ার পর তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বেরিয়ে দেখি এতটাই ঠাণ্ডা যে গ্লাভস থেকে হাত বের করা খুব কষ্টকর,বেশিক্ষণ খোলা হাত বাইরে রাখলে হাত একটু পরেই অবশ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ক্যামেরাটা ভালভাবে অপারেট করতে হলে হাত খোলা ছাড়া বিকল্পও নেই। ধীরে ধীরে একটা হলুদ-কমলা-লাল ঝলকানি দিয়ে সূর্য উঠা শুরু করল। চারিদিকে শুধু শাটারের শব্দ। সে এক বর্ণনাতীত মুহূর্ত - সত্যি সত্যি যদি আপনার কোন স্বপ্ন আপনার চোখের সামনে সত্যি হয়ে যায় তার অনুভূতিটাই অন্যরকম,সুবহানআল্লাহ সুবহানআল্লাহ।
বর্ষাকালে একবার বান্দারবনের থাঞ্চি যাবার সময় আনোয়ার ভাই পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য একটা সমতল পথে হাত বাড়িয়ে বলে উঠেছিলেন 'ওয়েলকাম টু

থাঞ্চি' যদিও তখনও আরও দুটো খাড়া খাড়া মান্দার গাছের রেলিং ছাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠা বাকি ছিল, কিন্তু স্রেফ সাহস জাগানোর আর আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য তিনি এই কাজটা করেছিলেন। আমিও সেদিন সান্দাকফুর চূড়ায় উঠে আসা পাশের সব ট্যুরিস্টকে 'ওয়েলকাম টু থাঞ্চি উপস্ সান্দাকফু' বলে হ্যান্ডশেক করা শুরু করলাম, এবং কাজটা করতে গিয়ে বুঝলাম তারাও আমার মতই আবেগাপ্লুত।

সাবারগ্রাম

আমাদের পরবর্তী প্ল্যান ফালুট যাওয়া। সান্দাকফু থেকে ফালুটের দূরত্ব ২১ কিলোমিটার আর ফালুটের উচ্চতা প্রায় ৩০০০ মিটার। ফালুট ট্রেকের বিশেষত্ব হচ্ছে এই ট্রেইলের কোথাও পানি নেই। শুধু ১৪ কিলোমিটার দূরে সাবারগ্রাম নামে একটা জায়গা যেখানে ছোট্ট একটা এস.এস.বি. ক্যাম্প আছে। এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য খাবার-পানি আর বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে একটা পথ নিচে 'মলে' নামক একটা জায়গায় নেমে গিয়েছে সেটা দিয়ে গুরদুম হয়ে শ্রীখোলা যাওয়া যায়।

সবরগ্রামের উদ্দেশে

সান্দাকফু থেকে সব গুছিয়ে রওনা দিতে দিতে আমাদের সাড়ে দশটা বেজে গেল। যাবার সময় বার বার চেয়ে থাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্টের দিকে, ক্ষণে ক্ষণে ফিরে ফিরে চাই। যতই এগোচ্ছি ততই কাঞ্চনজঙ্ঘা বড় হয়ে উঠছে। সান্দাকফু থেকে সাবারগ্রাম যাবার ট্রেইলটা এত সুন্দর আর মোহময় যে কেউ না গেলে তাকে বোঝানো যাবে না। অনন্ত অসীম দিগন্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্ট, মেঘের খেলা, ছায়া আর রোদের লুকোচুরি ... স্বপ্নের মত । ফালুট ট্রেইলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধু ফসলের গমের গাছগুলোকে ঘাস ভেবে নিলেই আমেরিকার প্রেইরি-র স্বাদ আপনি এখানে নিতে পারবেন।এই পর্বতে কোন জীবিত গাছ দেখতে পাওয়া বিরল, যদিও পুরোটা পর্বতই সবুজ দূর্বা ঘাসে ঢাকা। কখনোসখনো এক-আধটা গাছের পোড়া কঙ্কাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই এলাকায় প্রচুর বজ্রপাত হয়, বাতাসের বেগও এখানে অসম্ভব বেশি।

হাঁটতে হাঁটতে গতবারের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। কিছুদূর যাবার পর সেই জার্মানদের দেখা পেয়েছিলাম। দেখি একটা উঁচু ঢালের উপরে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা, আমরাও বসে পড়েছিলাম। আমি চকলেট খেয়ে অভ্যাসবশত র‍্যাপারটা ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। ফেলামাত্রই দেখি জার্মানদের গাইড দৌড়ে র‍্যাপারগুলো তুলে নিজের পকেটে ভরে রাখল। এটা দেখে এতটাই লজ্জা পেয়েছিলাম যে বাকি পুরো ট্রেইলে কোথাও চকোলেটের খোসা ফেলিনি। আর ফালুট ট্রেইলে কোন কোন জায়গাতে দেখা যায় একটা বড় টিনের কন্টেনার কেটে ডাস্টবিন বানিয়ে বাঁশ দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর থেকে একদম সুবোধ বালকের মত পকেটে জমিয়ে রাখা সেই খোসাগুলো এই ডাস্টবিন খুঁজে খুঁজে তাতে ফেলেছি।

সেবারে সাবারগ্রামের শেষে উঠার সময় খুব কষ্ট হয়েছিল, এমনকী ব্যাথার পা নিয়ে রুবেল ভাইও আমাকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল, মাথার উপরে ছিল গনগনে সূর্য, একটুতেই হাঁপিয়ে উঠছিলাম আর থেমে থেমে পানি খাচ্ছিলাম। দুপুরবেলায় সাবারগ্রাম পৌঁছেছিলাম।

এবারে সাবারগ্রামে এসে একটা মজার ঘটনা ঘটল। আমরা ন্যুডলস খেতে চেয়েছিলাম, কেয়ারটেকার বলেই দিলেন স্যুপ হবে না। ভাবলাম নিজেরাই রান্না করব। ন্যুডলস-এ পানি দিলাম ফোটানোর জন্য কিন্তু এই গনগনে আগুনের তাপেও পানি আর গরমও হয় না, ফুটেও না। দুজনে চিন্তায় পরে গেলাম ঘটনাটা কী এত এত জাল দিচ্ছি কিন্তু পানি গরম হয় না কেন! পরে বুঝলাম এই ৩৬০০ মিটার উচ্চতায় জল গরম হতে একটু সময় নেবে বইকি। পিঁয়াজ টমেটো কাঁচামরিচ কেটে কড়াই-এ ডিম ভেজে তেল দিয়ে আমরা রেডি কিন্তু ন্যুডলস আর সিদ্ধই হয়না! শেষে কুড়ি মিনিটের রান্না এক ঘন্টায় সেরে খেয়ে দেয়ে ফালুটের দিকে রওনা দিলাম।

ফালুট

গতবারে সাবারগ্রাম ক্যাম্পে একটা কালো-বাদামি রোমশ কুকুর দেখেছিলাম,আমরা রওনা দেবার সাথে সাথেই সেও আমাদের সঙ্গী হয়েছিল।

ফালুটের ট্রেইলে গাড়ি চলার মাটির পথ এবং কোথাওবা পাথরের খাঁজ করা। মজার বিষয় হচ্ছে এই ট্রেইলটা যে কেন ভাল লেগেছে তার কোন যৌক্তিক কারণ আমি বলতে পারব না - হয়ত পথের ওপরে বিকেলের সূর্যের আলোর খেলা, হয়ত সেই কুকুরটার সাথে আমাদের ভাব নিয়ে চলা - হয়ত বিকেলের স্বাভাবিক নস্টালজিয়া - মেঘের আসা-যাওয়া...কে জানে!

www.amaderchhuti.com

ফালুট

কুকুরের কাহিনিটাই বলি - সে নিশ্চুপভাবে আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল। মাঝে মাঝে আমি থেমে যাই ছবি তুলতে, তখন রুবেল ভাই আর নিমাহ অনেক সামনে চলে যায়। কিছু দূর হাঁটার পর দেখি কুকুরটা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি প্রথমে বুঝিনি, মনে করেছিলাম বুঝি ফিরে যাবার জন্য দাঁড়িয়েছে। ওমা, আমি কাছে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার সামনে হাঁটা দিল এবং একজন প্রশিক্ষিত গাইড যেভাবে কিছুক্ষণ পর পর ট্রেইলের পিছনে দেখে, সেও কিছুক্ষণ পর পর পিছনে ফিরে দেখে নিচ্ছিল আমি তাকে ফলো করছি কিনা!

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য আমি ইচ্ছা করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ছবি তুললাম। হেঁটে একটা বাঁক ঘুরেই দেখি সে হলিউডের ছবির নেকড়েদের মত মাথা উঁচু করে বসে আছে। তাকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে যাওয়া মাত্রই সে আবার আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। কিছু কিছু জায়গায় নিমাহ আমাদের শর্টকাট দিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু আমি দেখলাম সেই কুকুরটা রেগুলার ট্রেইলেই দৌড়ে আগে পৌঁছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আগে কোথাও একা হয়ে গেলে নিমাহর লাল জ্যাকেট খুঁজতাম দৃষ্টি সীমানায়,এরপর থেকে খুঁজেছি সেই চার পেয়ে গাইডকেই। এমনকী একবার কুকুরটাকে দেখতে না পেয়ে আমিই উল্টে নিমাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কই? নিমাহ হেসে হেসে বলল আছে, সামনেই আছে, জায়গা মত কোন এক বাঁকের মাথায়, এবং ঠিক তাই!

ফালুটের আগে একটা যায়গায় দেখলাম গলায় ঘন্টা বাঁধা ইয়াক, দেখেই মনটা আনন্দে নেচে উঠল, যাক হয়ত আর বেশি দূর না। কিন্তু না,ফালুট আর আসে না। একটা একটা করে পর্বতের ঢাল পার হই আর মনে হয় এটাই ফালুটের পর্বত, কিন্তু না মাঝে আর একটা - আর একটা পার হলে আবারও একটা...।

এভাবে ফালুট পৌঁছাবার ঠিক আগে একদল ঠাণ্ডা ঝড়ো গতির মেঘ এসে আমাদের ঢেকে দিল, ফালুটের লজে আসার পর এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম যে ঘরের ভিতরে না ঢুকে বাইরেই দেয়ালে ঠেশ দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। পরে ঢুকে দেখি পুরো ট্যুরিস্ট লজে আমরা আর একটা সুইডিশ কাপল।

রাতে সেবারে রীতিমত শিলাবৃষ্টি নেমেছিল, টিনের চালে ঠাশ ঠাশ আওয়াজে মন চলে গিয়েছিল আমাদের ময়মনসিং-এর বাসায় যেখানে টিনের চালের সেই বৃষ্টি-শিলার আওয়াজে কাঁথামুড়ি দিয়ে জেঁকে ঘুমাতাম। জানালাগুলোতে কাচের শার্সি কাঁপিয়ে একটু পর পর সাইরেনের মত শব্দ করে ঝোড়ো বাতাসের এক একটা ঢেউ এসে রুমের ভিতরেও ঠাণ্ডার একটা হিমেল স্রোত বইয়ে দিচ্ছিল।

এবারেও ফালুটে থাকার জায়গা মিলল। গতবারের মতো ঝড়-ঝঞ্ঝা নেই, বেশ নিরুপদ্রবেই ঘুম হল। ভোরে উঠেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি তুলতে উপরে উঠে গেলাম। গতবারের মত এবারও সাথে পানি নিতে ভুলে গিয়েছি। দেখি ঘাসের ওপর শিশির জমে বরফ হয়ে আছে। গতবারতো এই বরফ মুখে দিয়েই তেষ্টা মিটিয়ে ছিলাম। পুরো পর্বতের চূড়াই ঘাসের সবুজের সাথে সাদা জমে যাওয়া শিশির বরফে একাকার। কিছু ওপরেই একটা সীমানা পিলার যার একপাশে নেপাল - কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে, ডান পাশে সিকিম আর পিছনে-বামে পশ্চিমবঙ্গ। এর কাছেই একটা ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দির - আলগা পাথর দিয়ে ছোট্ট একটা তাঁবুর মত করে বানানো।

কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেস্ট আর দিগন্তের নৈসর্গিক ছবি তুলতে তুলতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি রমাকান্তদাদের তিনটি বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে ... এভাবে একা একা একটি বিরাট পর্বতের চূড়ায়...। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলাম প্রকৃতির কাছে আমরা কতটাই ক্ষুদ্র।

গোরখে

সিঙ্গালিলা পার্ক ধরে গোরখের দিকে নেমে যাওয়া রাস্তাটা অসাধারণ। ঘন, গহিন পাইন বনের ভিতরে কোথাও মাটিকাটা, কোথাওবা পাথর সাজিয়ে ৬-৮ ফিট

প্রশস্ত রাস্তা। গোরখে নামার ঠিক আগে একটা খাড়া জিক-স ZzZ কৌণিক রাস্তা নেমে গিয়েছে। গতবারে মিরিকের মত এই জায়গাটাতেও আমি পূরো একদিন থাকার ভবিষ্যৎ প্ল্যান করে ফেলেছিলাম যদিও এবারেও সেটা সম্ভব হয়নি। আমরা রাম্মাম পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যার এক-দেড় ঘণ্টা আগে, রাম্মাম ট্রেকিং লজের ভিতরে যাওয়া মাত্রই শুরু হল বৃষ্টি,অঝোর ধারায়। অন্ধকার হবার পর জানলা দিয়ে দেখলাম পাহাড়ের এক কোনায় অনেক অনেক আলো ছড়িয়ে আছে,নিমাহ কে জিজ্ঞাস করলাম এটা কোথায়? বলল এই আলো দার্জিলিং-এর, আমরা তো তাজ্জব, দার্জিলিং-এর এত কাছে আছি আমরা!

এবারেও সকাল সকাল রওনা দিলাম গোরখের উদ্দেশ্যে ... সেই পরিচিত ট্রেইল সেই পরিচিত রাস্তা, শর্টকাট হেঁটে যাবার সময় কী যে ভাল লাগছিল তা যে দ্বিতীয়বার গিয়েছে, সেই জানে। সন্ধ্যার কিছু আগে রাম্মাম পৌঁছুলাম।

গোর্খে

রিম্বিক

রিম্বিক যাবার পথে কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম পেরোতে হয়। যে পাহাড়টা ধরে নেমে যাচ্ছি তার পাশের পাহাড়টাই সিকিম। অনেক লোকালয়,মোবাইলের টাওয়ার, পাহাড়ি ঘর-বাড়ি দেখে দেখে নেমে যাচ্ছি শ্রীখোলা ঝরনার দিকে, এই ঝরনার ওপর দিয়ে একটা কাঠের টানা ব্রিজ আছে যেখান থেকে পুরো ঝরনাটা আর উপত্যকাটার একটা বর্ণনাতীত ছবি পাওয়া যায়। শ্রীখোলা থেকে কিছুটা ওপরে উঠলেই সিপ্পি নামে একটা জায়গা। সেখান থেকে একটা গাড়ির রাস্তা সোজা রিম্বিকের দিকে গিয়েছে। ট্রেকিং শেষ... এবার ঘরে ফেরার পালা। রিম্বিকে নেমে এসে ফেরার গাড়ি ধরলাম।

সান্দাকফু-ফালুট ট্রেক রুট ম্যাপ || সান্দাকফুর তথ্য

ট্রেকের ছবি - মাহমুদ ফারুক ~ ট্রেকের আরো ছবি

পেশায় ওয়েব ডিজাইনার এবং ডেভেলাপার ফারুকের জীবনের আরেক নাম ভ্রমণ। সময় পেলেই বেরিয়ে পড়েন সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে ট্রেকিং-এ।

Rate This : - select -
Total Votes : 43
Average : 4.47

www.amaderchhuti.com

Like 101 people like this.

tell a Friend

Post Comments

I did my best to explain all the experience that I had but actually there are many more to be written. BTW - I have written down to several detailed blog for both trekking journey which you can see here in the link http://www.somewhereinblog.net/blog/mmhfarooque Thanks

- Mahmud Farooque [2013-03-18]

AAPNI ETOTAI IN DETAILS LIKHECHHEN PORE DARUN BHALO LAGLO, ONEK TATHYA JANA GALO AAR IN FUTURE JARA TREKKING KORBEN TARA DARUN UPOKRITO HOBEN.

- shila saha [2013-03-09]

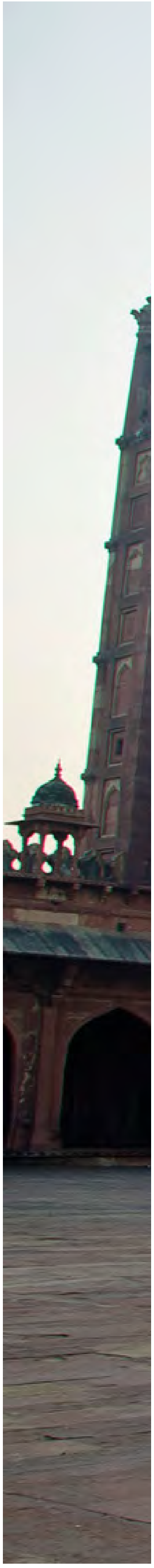

ইতিহাসের শহরে

মহুয়া ব্যানার্জি

~ তথ্য - ফতেপুর সিক্রি ~ ফতেপুর সিক্রির আরো ছবি - রত্নদীপ দাশগুপ্ত ~

শ্বেত শুভ্র মার্বেল পাথরে তৈরি সেলিম চিস্তির দরগার সামনে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে এক ফকির। মনে পড়ছিল সেই বহু জনশ্রুত গল্পটির কথা। সম্রাট আকবর ও তাঁর স্ত্রী যোধাবাঈ বহুদিন অপুত্রক ছিলেন। পুত্রসন্তান লাভের মনস্কামনা নিয়ে সম্রাট আকবর সস্ত্রীক আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রিতে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন সেলিম চিস্তির দরগায় দুয়া চাইতে। আকবর ও যোধাবাঈ-এর মনোবাঞ্ছা পূরণ করে তাঁদের কোলে জন্ম নেন জাহাঙ্গীর। সেলিম চিস্তির দরগায় তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁরা শিশু জাহাঙ্গীরের নাম রাখেন "সেলিম"।

আগ্রা থেকে ৩৭কিমি দূরে অবস্থিত এই শহরটিতে প্রথমে কেবল সুফি সন্ন্যাসী সেলিম চিস্তির দরগাই ছিল। সুফি ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে এই দরগায় এসে প্রার্থনা করলে মনস্কামনা পূরণ হয়। সেলিম চিস্তির দরগা, আজমের শরিফের দরগার মতই সুবিখ্যাত। পুত্রলাভের পর ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর এই স্থানটিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ছোট্ট একটি শহরে পরিণত করেন। ১৫৭২ সালে আকবর ফতেপুর সিক্রি থেকে গুজরাট সফরে যান এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যুদ্ধ জয়ের পর এই শহর নাম হয় "ফতেহাবাদ" বা "জয়ের শহর"। আগ্রা থেকে মুঘল রাজধানী সরে আসে ফতেপুর সিক্রিতে।
সম্রাট আকবর ছিলেন উদার মনের মানুষ। তাঁর সৃষ্ট "দিন-ই-ইলাহী" সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বাসনায় গঠিত। ফতেপুরসিক্রির আভ্যন্তরীণ কারুকার্যে রয়েছে পার্শী প্রভাব। নানা জায়গায় রয়েছে মুসলীম শৈলীতে জালির কাজ। লাল পাথরের দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা কারুকাজে হিন্দুরীতিতে লতাপাতা ও দেবদেবীর চিহ্ন। আবার বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টীয় স্থাপত্যের প্রেরণাও আছে কোথাও কোথাও।

সেলিম চিস্তির দরগাটি একতলা। চৌকাকৃতি ইমারতটি সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। দরগার ভেতরে শায়িত আছে সুফি সন্ন্যাসীর মরদেহ। এখনও বহু মানুষ দরগায় সুতো বেঁধে দিয়ে যান - ইচ্ছা পূরণের আশায়। সেলিম চিস্তির আখ্যানের মধ্যে কখন তলিয়ে গিয়েছিলাম, চমক ভাঙল ছেলের ডাকে, তাকিয়ে দেখি সে আঙুল দেখাচ্ছে মস্ত বড় এক দরজার দিকে। ও বাবাঃ সে যে কি প্রকাণ্ড এক দরজা - শিশুমনতো আশ্চর্য হবেই দরজাটির বিশালত্ব দেখে, আমরাই অবাক হয়ে যাচ্ছি। গাইড বললেন, এ হচ্ছে সেই ইতিহাস বিখ্যাত "বুলন্দ দরওয়াজা"। মেহগনি রঙের দরজাটি দৈর্ঘ্যে যেমন তেমনই প্রশস্তও বটে। গাইডের কাছ থেকে জানতে পারি এটি ৫৪ মিটার লম্বা। দুটি ভারী পাল্লা প্রচুর কারুকার্যময়। চওড়া দরজার গায়ে কাঠ খোদাই করে ছোট ছোট ফুল ও আরও বিচিত্র সব কারুকাজ খুব যত্ন সহকারে করা হয়েছে। "বুলন্দ দরওয়াজা" শব্দের অর্থ হল "বৃহৎ দরজা"। সত্যি,এই দরজার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে একটা হাতি ঢুকে যেতে পারবে। এই বুলন্দ দরওয়াজাই হল ফতেপুর সিক্রি শহরটিতে প্রবেশ করার অন্যতম দ্বার। "বুলন্দ দরওয়াজা"র সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি শিল্পীর সৃষ্টিকে। দরজার ওপাশে বিস্তৃত নীল আকাশ। আর দূরে পুরো শহরটির এক ঝলক। আকবরের আমলে প্রায় কুড়ি পঁচিশজন সৈন্য মিলে দরজার একটি পাল্লা খুলতে সক্ষম হত।
এগিয়ে গেলাম জামা মসজিদের দিকে। লাল পাথরের গায়ে মাঝে মধ্যে শ্বেতপাথর বসিয়ে বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য। কিছু জায়গায় ছত্রী ও জালির কাজ। মসজিদের মাথায় একটা বড় সাদা গম্বুজ। সম্রাট আকবরের আমলের অনেক আগে থেকেই এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন হয়। অতীতের মতো আজও প্রতি শুক্রবার নামাজের ধ্বনিতে মুখরিত হয় এখানকার আকাশ।
ইতিহাসের গল্পকথা শুনতে শুনতে যেন ইতিহাসের পথ ধরেই পৌঁছে গেলাম "নহবৎ খানা"-য়। "হাতিপোল গেট" বা "এলিফ্যান্ট গেটে"র ঠিক পাশে অবস্থিত 'নহবৎ খানা' প্রকৃতপক্ষে একটা স্টেজের মতো। এক সময়ে এখানে নহবৎ-এর আসর বসত। রাজা এলে ঢাকঢোল সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মহারাজকে সম্বর্ধনা জানানো হত। কালচক্রের আবর্তনের ফেরে একদা মুখর সে নহবৎখানা আজ শূন্য। জৌলুসহীন ও মূক হয়ে পড়ে আছে। রয়ে গেছে শুধু তার কঙ্কালসার কাঠামোটাই।
হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম "কিংস্ গেট"- কবরখানা। এখানে মুঘল পরিবারের মৃত পুরুষদের কবর দেওয়া হত। মহিলাদের সমাধিস্থ করার স্থান আলাদা- একটু ভিতরে। মোগল সাম্রাজ্যের মহিলারা পর্দানসীন ছিলেন - তাঁদের কবরও একটু অন্তরালে সাজানো, নীরবে নিভৃতে তাঁরা ঘুমিয়ে আছেন। কোন কোন কবরের ওপর সাজানো রয়েছে ফুল-মালা। ধূপের গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠেছে। এরই মাঝে একটা গুপ্ত দরজা দেখিয়ে গাইড জানালেন যে এর তলায় নাকি সুড়ঙ্গ পথ আছে যা আগ্রা পর্যন্ত গিয়েছে। মনে মনে ভাবলাম সত্যি না জানি কত গোপন রাজকাহিনি জমা হয়ে আছে এখানকার ইঁট বালির পরতে পরতে। গা টা একটু ছমছম করে উঠল।
"অনুপ তালাও" একটি ছোট্ট জলাশয়। তানসেন নাকি এই সরোবরের মাঝে বাঁধানো জায়গায় বসে গান গাইতেন! জলাশয় ঘিরে বসতেন সৌভাগ্যবান শ্রোতারা - এক প্রান্তে সম্রাট আকবর - পাশে প্রাসাদের ঝরোখার আড়ালে থাকতেন যোধাবাঈ ও অন্যান্য মহিলারা। সরোবরের স্ফটিক-স্বচ্ছ জল এখন শ্যাওলায় গাঢ় সবুজ। পাঁচতলা হাওয়া মহল পেরিয়ে চত্বরের অন্য পাশে "দিওয়ান-ই-খাস"। মহারাজা ও মন্ত্রীদের "খাস" বা গুপ্ত বৈঠক হত এখানে - বৈঠক অর্থাৎ ছেলেবেলায় ইতিহাস বই-এ পড়া আকবরের 'নবরত্ন সভা'! সত্যিই বীরবল, টোডরমল, আবুল ফজল সবারই বাড়ি আজো আছে ফতেপুর সিক্রিতে।

"দিওয়ান-ই-আম"- সাধারণ মানুষের জন্য রাজ দরবার - একপাশে মুঘলসম্রাট ও তাঁর মন্ত্রীদের বসার জায়গা। কালো স্লেট পাথর দিয়ে বাঁধানো। সামনে জনগণের বসার জন্য সুবিশাল চত্বরের ওপর দিনান্তের ছায়া নেমে আসছে ধীরে ধীরে। আকাশে পায়রার ওড়াউড়ি। নির্জন নহবৎখানায় আর খালি ইমারতগুলির ঘুলঘুলিতে ওদের বসবাস।

ফেরার সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি দেখি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওপরেই - ও এই শহরেই থেকে যেতে চায় - ওই সুন্দর কারুকাজ করা লাল পাথরের বাড়িগুলিতে। অনেক বোঝানোর পর শেষপর্যন্ত অতীতের শহর থেকে বর্তমানে ফিরে আসতে রাজি হল। ততক্ষণে পুরোপুরি সন্ধ্যা নেমে গেছে - অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা গ্রাস করছে জনশূন্য শহরটিকে...।

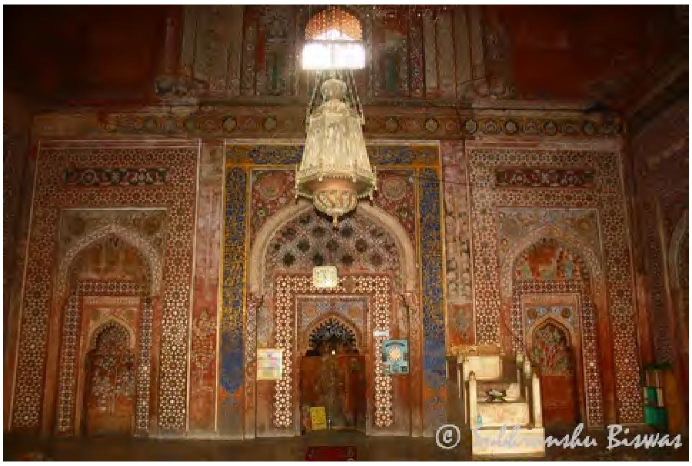

www.amaderchhuti.com

~ তথ্য - ফতেপুর সিক্রি ~ ফতেপুর সিক্রির আরো ছবি - রত্নদীপ দাশগুপ্ত ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী মহুয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লেখেন। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন দেশে-বিদেশে।

কাকাবাবু হেরে গেলেন?

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ তথ্য- আন্দামান || আন্দামানের আরো ছবি ~

মনটা বেশ খারাপ - সকালবেলাতেই খবরটা পেলাম - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চলে গেলেন - আর সেইসঙ্গে আমার অনেকটা ছেলেবেলা...।
দিকশূন্যপুরের নীলু নয়, বরং কাকাবাবু নেই এটা ভাবলেই মনে হচ্ছিল কী যেন একটা হারিয়ে ফেললাম। ভাবতে ভাবতেই ফিরে যাচ্ছিলাম ছেলেবেলায় - দুই ভাই-বোনে কাড়াকাড়ি করে পূজাবার্ষিকী পড়া, ছোট আনন্দমেলায় 'পাহাড় চূড়ার আতঙ্ক'-র টানটান উত্তেজনা - পরের সংখ্যায় সন্তু-কাকাবাবুর কী হবে সেই উৎকণ্ঠা, আর টিভি-কম্পিউটার এমনকী ইলেকট্রিসিটিহীন সেই অন্য শৈশবে বড় পর্দায় 'সবুজ দ্বীপের রাজা' - প্রথম সমুদ্র দেখা - আন্দামান - সেলুলার জেল। শেষ দৃশ্যে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভূতি...।
মনে পড়ছিল কয়েকবছর আগের আন্দামান ভ্রমণের টুকরো স্মৃতি।

অনেকবছর পর এক বৃষ্টিভেজা দুপুর-বিকেলে সেলুলার জেলের সামনে দাঁড়িয়ে শৈশবের সেই অনুভূতিই যেন ফিরে এসেছিল। শেষ বিকেলে এক পশলা বৃষ্টির পর চারপাশটা কেমন থমথমে হয়েছিল। জেলের নিস্তব্ধ করিডরে শুধু নিজেদের পায়ের শব্দ। পরপর অন্ধকার কুঠুরি - লোহার গারদ দেওয়া। কত মানুষের জীবনই হয়তো কেটে গিয়েছে এই অন্ধকারে। 'সবুজ দ্বীপের রাজা'-র প্রথম দৃশ্যে দেখা সেলুলার জেল, বিপ্লবী গুণদা তালুকদারের কাহিনি মনের মধ্যে ফিরে ফিরে আসছিল।
১৯০৬ সালে সুবিশাল এই জেলটির নির্মাণকার্য শেষ হয় অসংখ্য কয়েদীর ঘাম ঝরানো পরিশ্রমে। সাতটি শাখায় মোট ৬৯৬টি সেল বা খুপরি ঘর ছিল। এর থেকেই নাম হয় সেলুলার জেল। মাঝের গম্বুজের মাথায় ছিল অবজার্ভেশন টাওয়ার। একেকটা ব্লকের সামনে অন্য ব্লকের নিরেট দেওয়াল। যাতে বিভিন্ন ব্লকের কয়েদিরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ না করতে পারে। দুটো ব্লকের মাঝে বেশ কিছুটা খোলা জমি। সামনেই ফ্লগিং ট্র্যাংগেল - কয়েদিদের বেত মারা হত এখানে। বাঁদিকে এখন তৈরি করা হয়েছে শহিদ বেদী। ডানদিকে চালাঘরে ছিল ওয়ার্কশপ আর ঘানি - সারাদিন সেখানে অমানুষিক পরিশ্রম করে দিন কাটত কয়েদিদের। উঠোনের একপাশে রান্নাঘর, আরেকদিকে ফাঁসির কড়িকাঠ।
১৯৭৯ সালে সেলুলার জেলকে 'জাতীয় স্মারক'-এর সম্মান দেয় ভারত সরকার। ভূমিকম্প আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের আক্রমণে এই জেলের চারটি উইং ধ্বংস হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। ভেঙ্গে যাওয়া অংশে গড়ে উঠেছে সরকারি গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল।

নির্মাণের একশো বছর পর ঐতিহাসিক সেই তীর্থক্ষেত্রে আমি দাঁড়িয়ে। সত্যি, তীর্থক্ষেত্র বলেই মনে হয়েছিল আমার। ভারতবর্ষের কোন মন্দির-মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে কখনো এই অনুভূতি হয়নি। মনে হয়েছিল, সেলুলার জেলে দর্শনার্থীরা জুতো খুলে ঢোকেনা কেন? কত মানুষ তাঁদের জীবন দিয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য। আর আমরা, সেই স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে তাঁদের কি এইটুকু শ্রদ্ধাও জানাতে পারিনা?
মন খারাপ করা মেঘলা বিকেলে গাইডের মুখে সেলুলার জেলের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে কল্পনায় ভেসে উঠছিল ফেলে আসা দিনগুলোর অদেখা ছবি। আজও যেন চোখ বুজলেই শুনতে পাওয়া যায় শিকলের শব্দ, ঘানির আওয়াজ আর কয়েদিদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিধ্বনি। ডেভিড বেরির শূন্য চেয়ার, ঘানিঘর আর ফাঁসির দড়ি সেদিনের নীরব সাক্ষী হয়ে ওঠে।
রসদ্বীপ, ভাইপার আইল্যান্ড সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের ছবি। পোর্টব্লেয়ারের আবেরদিন জেটি থেকে চোখে পড়ে রস দ্বীপ। দ্বীপে ঢোকার পর খানিকটা হেঁটে গেলে নজরে পড়ে গভর্মেন্ট প্রেস- এর ভেঙ্গে পড়া বাড়িটা। বিশাল এক বটগাছের ঝুরি আর শেকড়বাকড়ের আলিঙ্গনে হারিয়ে গেছে ইঁটের গাঁথুনি। ক্লাব হাউসের বাঁধানো চাতাল, সুইমিং পুলের ভাঙ্গা চৌবাচ্চা, বরফকল ও বেকারির ভগ্নাবশেষ পেরিয়ে সুরকি বাঁধানো রাস্তা উঠে গেছে ওপরে। একদিন এই পথেই চলত কয়েদিদের টানা বাহারি পিতলের রিক্সা। টিলার একেবারে মাথায় বিশাল এক চার্চের ধ্বংসাবশেষে। এইখানেই কোথাও পাঞ্জা আর তার সঙ্গীরা শলাপরামর্শ করছিল। সেই ঘনসবুজ নারকেল গাছে ভরা দ্বীপের অপরূপ সৌন্দর্য ছেলেবেলার স্মৃতিকে আবারও ফিরিয়ে আনল। টিলার মাথায় বাঁয়ে অল্প এগোলে নিশ্চিহ্নপ্রায় কমিশনারের বাংলো আর ডানদিকে কিছুটা এগোলেই নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে

www.amaderchhuti.com

ভেসে ওঠে নীল সমুদ্র আর নির্জন রুপোলি সৈকত।
আন্দামানে প্রথম জেল গড়ে উঠেছিল ভাইপার দ্বীপে, ১৮৬৪-৬৫ সালে। ১৮৭২ সালে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মেয়োকে হত্যা করার অপরাধে এই ভাইপার দ্বীপেই ফাঁসি হয় বিপ্লবী শের আলির। আজও ভাইপার দ্বীপের টিলার মাথায় কয়েদীদের স্মৃতি বুকে করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের বাড়িটা। শেষ বিকেলে নেমে আসছি টিলার ওপর থেকে, কানে ভেসে আসে গাইডের কথাগুলো - ভাইপার দ্বীপ ভারতীয়দের কাছে পীঠস্থান...শহীদদের স্মৃতি জড়ানো এর প্রতিটি ধূলিকণায়...। ফিরে তাকিয়ে দেখি লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেড়শো বছরের প্রাচীন ফাঁসিকাঠের পিছনে।
কিন্তু গুণদা তালুকদারকে নয়,আমিতো 'সবুজ দ্বীপের রাজা'-কে খুঁজছিলাম। আর দুচোখ ভরে অপার বিস্ময়ে দেখছিলাম ঘন নীল সমুদ্র,রুপোলি বেলাভূমি,আর নারকেল গাছে ছাওয়া সবুজ দ্বীপের অপরূপ শোভা।
পোর্টব্লেয়ার থেকে হ্যাভলক যাওয়াই আমার প্রথম জাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতা। আন্দামানে পৌঁছেছিলাম সন্তুদের মতোই প্লেনে। আকাশ থেকে সন্তুর মতোই মনে হচ্ছিল,সমুদ্রের জলটা এতটাই নীল যেন কলম

ডোবালে লিখেও ফেলা যাবে তাই দিয়েই। আর সেই ঘন নীলের বুকে পান্নার মালার মতো দ্বীপগুলোকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবারে জাহাজে চড়ে আবার মনে পড়ছিল চলচ্চিত্রে নীল সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজের এগিয়ে চলার সেই দৃশ্য। জেটির কাছাকাছি সবুজ জল ক্রমশ সমুদ্রের গভীরে কালচে নীল হয়ে উঠছে আর সেই 'কালাপানি'র বুকে সাদা ফেনা ছড়িয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। সাদা ফেনার মাথায় ঝিকমিক করছে রোদ্দুর। জলের বুকে লাফ দিচ্ছে উড়ুক্কু মাছের দল। চোখে পড়ছে কালো সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা আদিম জঙ্গলে ঘেরা সবুজ দ্বীপ আর সোনালি বালুকাবেলা।
পোর্টব্লেয়ার থেকে মিডল আর নর্থ আন্দামানের ভেতর দিয়ে যে চওড়া গাড়ির রাস্তা একেবারে মায়াবন্দর হয়ে দিগলিপুর পর্যন্ত চলে গেছে তার নাম আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড। এই পথেই পোর্টব্লেয়ার আর রঙ্গতের মাঝে জারোয়া রিজার্ভ। মায়াবন্দর থেকে শেষ রাতে রওনা দিয়ে বারাটাং পৌঁছেছি বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ। বার্জে করে সাগর পেরোবে গাড়ি, তার লম্বা লাইন পড়েছে। সেই অবকাশে আমরা আবার নৌকায় উঠে পড়ি - গন্তব্য লাইমস্টোন কেভ। নীল-সবুজ জলে ভেসে যেতে যেতে ঢুকে পড়ি ম্যানগ্রোভ অরণ্যের গভীরে। নৌকো কখন সমুদ্র ছেড়ে খাঁড়ি দিয়ে চলেছে - দুপাশের জঙ্গল নিবিড় হয়ে ছুঁতে চাইছে আমাদের। নৌকো থেকে নেমে কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে ধানক্ষেত, পাহাড়ি উঁচুনিচু পথে এগিয়ে চলা - জঙ্গল ক্রমশ গভীর হতে থাকে। আবছা অন্ধকার গুহার ভেতরে ঢুকে মুগ্ধ হই - প্রকৃতি তার আপন খেয়ালেই পাহাড়ের গায়ে সাদা আর হলুদ চুনাপাথরে গড়েছে অপূর্ব সব ভাস্কর্য। এ যেন আদিম অরণ্যের এক রূপকথা।
লাইমস্টোন কেভ ঘুরে আমরা যখন গাড়িসমেত বার্জে চেপে জিরকাটাং পৌঁছালাম তখন প্রায় বেলা তিনটে বাজে। এখান থেকেই জারোয়া রিজার্ভে ঢুকতে হয়। গাড়ি যাবে পুলিশ প্রহরায় - একা নয়, পুরো একটা গাড়ির দল অর্থাৎ কনভয়ের সঙ্গে। পথে কোথাও গাড়ি থামানো বা ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। চেকপোস্টের সামনে গাড়ির সারি। জেটির একপাশে

www.amaderchhuti.com

ছোট একটা হোটেলে দুপুরের খাওয়া সারছি, হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের জঙ্গল থেকে এক জারোয়া রমণী তার ছোট ছেলেকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল পুলিশ চৌকির পাশে একটা অস্থায়ী চালাঘরের দিকে। আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন জারোয়া অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষ জড়ো হল সেখানে। চালাঘরের বাইরে তখন ক্যামেরা হাতে ট্যুরিস্টদের ঠেলাঠেলি। আর দরজা আটকে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে হাত পাতছে হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি-মাথায় টুপি পরা এক জারোয়া তরুণ। সভ্যতার বিষাক্ত ছোঁয়া সত্যি মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে! মনে পড়ল বন্য জারোয়াদের সম্বন্ধে 'সবুজ দ্বীপের রাজা'-র সেই উক্তি -"তোমাকে কে বলেছে, এই জারোয়ারা অসভ্য? আর এই সাহেবরা কিংবা তোমরা সভ্য?"
বেলা চারটেয় দিনের শেষ কনভয়ের যাত্রী আমরা। জারোয়া রিজার্ভের গভীরে যত ঢুকছি ততই বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি - অরণ্যের চরিত্র - আদিম ঘন জঙ্গল মাথা ঠেলে তুলেছে আকাশে। পাতার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে তেরছাভাবে এসে পড়েছে শেষ বিকেলের সোনাঝরা রোদ্দুর। শহুরে পোর্ট ব্লেয়ার,সবুজে সাজানো নীল-হ্যাভলক -এভিস দ্বীপ, এমনকী লাইমস্টোন কেভের পথের থেকে একেবারে অন্য রকম জারোয়া রিজার্ভের আদিম নিবিড় জঙ্গল। অচেনা গাছের ভিড়ে চিনতে পারি বড় বড় বাঁশঝাড়, জংলি পাম আর বুনো কলাগাছ। দ্রুত বেগমান গাড়ির জানলা দিয়ে দুচোখে ছুঁয়ে মনে হচ্ছে যেন ফিরে গেছি হাজার হাজার বছর আগে। এখানে সময় যেন থমকে আছে এখনও। দুপাশের ঘন আদিম জঙ্গলের মাঝে এই মসৃণ কালো

পিচের রাস্তা বড় বেমানান লাগে। কনভয়ের গাড়িগুলো সব এখন আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের আগে-পিছে আর কোন গাড়ি চোখে পড়ছেনা। হঠাৎ-ই সবাই কেমন চুপ হয়ে গেছে – এমনকি সঙ্গের দুই শিশু-ও। আমরা যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি এই অরণ্যে। পথে বেশ কয়েকবারই দেখা হয় জারোয়াদের দলের সঙ্গে। সভ্য মানুষ দেখে ওরা এখন অভ্যস্ত। বরং কৌতূহলী চোখে তাকায়। কোমরে-মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা প্রায়নগ্ন নারী-পুরুষ সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরছে শিকার আর ফলমূল সংগ্রহ করে। পথের পাশে হঠাৎ দেখি মুখে সাদা রঙের আঁকিবুকি কাটা হাসিমুখ বালকের দল। সবাই যেন কালো পাথর কুঁদে তৈরি করা ভাস্কর্য – বনের আদিম গাছ-লতার মতই সুন্দর।

পথ চলতে চলতেই গল্প বলে আমাদের ড্রাইভার শঙ্কর – আগে সভ্য মানুষ দেখলেই জারোয়ারা হয় আক্রমণ করত, নয় পালিয়ে যেত। জারোয়া রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরির সময়ও দুপাশে ইলেকট্রিক তার দিয়ে বেড়া করে রাখা হয়েছিল। বেশ কয়েকবছর আগে জারোয়াদের একটি বাচ্চা ছেলে গাছ থেকে পড়ে আহত হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসে সারিয়ে তুলে আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জারোয়াদের সঙ্গে সভ্যতার মূল স্রোতের বন্ধুত্বের শুরু হয়তো এই ঘটনাই। তবে এখনো জারোয়াদের প্রধান অংশ সভ্যতার থেকে দূরে জঙ্গলের গভীরে থাকতেই পছন্দ করে – এমনকী পথে আমাদের দেখা জারোয়ারা আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় তাদের কাছে ব্রাত্য! কে জানে সেখানে আজও কোন সত্যিকারের 'রাজা' হয়তো বেঁচে আছেন, তাদের রক্ষা করছেন সভ্যতার বিষবাষ্প থেকে।

সভ্যতার শহরে পৌঁছে যাওয়ার আগে আদিম অরণ্যের নিবিড় গন্ধে ফুসফুস ভরে নিতে নিতে ছেলেবেলার মতোই অবাক বিষ্ময়ে ভাবি, সত্যি, একবিংশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষের এক দ্বীপে, পৃথিবীর আদিমতম এক অরণ্যে এমন মানুষ আজও আছে যারা আগুন জ্বালাতেও শেখেনি – স্বার্থপর,আত্মকেন্দ্রিক এই নগরসভ্যতাকে অস্বীকার করে আজও তারা আদিম গোষ্ঠীজীবনে বাঁচার প্রয়াসে রত!

এবছরও মেয়ের কাছ থেকে টেনে নিয়ে আনন্দমেলার পাতা উল্টে সন্তু-কাকাবাবুর অভিযান পড়েছি। স্বাভাবিকই, এখন আর আগের মতো লাগে না, তবু জীবনের মধ্যাহ্নে এসে হয়তো এখন খুঁজে বেড়াই ছেলেবেলার সেইসব ভালোলাগার অনুভূতিগুলো – বইয়ের পাতায়, প্রকৃতির মাঝে...। মনে হয়, আমরা যারা সন্তুর সঙ্গে বড় হয়েছি তাদের মনে যে অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন কাকাবাবু, সেই ভাবনাগুলোকে আজ আর ছুঁতে পারি না কেন? কেন পারিনা আমার মেয়েকে সেই পৃথিবীটা ফিরিয়ে দিতে?

~ তথ্য- আন্দামান ‖ আন্দামানের আরো ছবি ~

'আমাদের ছুটি'-র সম্পাদক দময়ন্তী কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন দৈনিক 'কালান্তর', 'স্বর্ণাক্ষর' ও 'আজকাল' প্রকাশনার সঙ্গে। পাশাপাশি দীর্ঘ দিন ধরে মুক্ত সাংবাদিকতা করছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ভালোবাসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, বই পড়তে, ভ্রমণকাহিনি ও ছোটগল্প লিখতে, বেড়াতে আর 'আমাদের ছুটি' কে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে।

www.amaderchhuti.com

Rate This : - select -
Total Votes : 17
Average : 4.35

tell a Friend
Like 2 people like this.

Post Comments

ধন্যবাদ শীলা।

- দময়ন্তী [2013-03-10]

khub bhalo laglo aapner eai vromon kahini poRe,eto sundor barnonamoy je aamar Andaman jaor ichchheta beRe galo aar kato tathyo jana galo.

- shila saha [2013-03-01]

এক ভ্রমণে দুই দেশ

মঞ্জুশ্রী সিকদার

~ তথ্য - অস্ট্রেলিয়া ‖ অস্ট্রেলিয়ার আরো ছবি ~

১৮ নভেম্বর

গতকাল রাতে অস্ট্রেলিয়া এসে পৌঁছেছি। আমার সাত মহাদেশ পরিক্রমার লক্ষ্যপূরণে এটা ছ'নম্বর - বেশ উত্তেজনাই লাগছে।

আজকের সফরসূচী ব্রিসবেন ঘুরে গোল্ড কোস্টে পৌঁছানো। আমরা আটজনে একটা মিডিবাসে করে গাইড ডেলমা-র কথা শুনতে শুনতে আর জানলা দিয়ে নতুন দেশ - অচেনা শহর দেখতে দেখতে চলেছি। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় বন্দর শহর ব্রিসবেন, জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ, এখান থেকে ম্যাগনেসাইটের মত মূল্যবান খনিজ পদার্থ রপ্তানি হয়, মধুর জন্য কালো মৌমাছির চাষ করা হয়...। চলতে চলতে কখন ক্যাঙারু পয়েন্টে পৌঁছে গেছি। আগে নাকি এখানে অনেক ক্যাঙারু ঘুরে বেড়াত। এখন শুধু নদীর ধারে অনেকটা ওপরে ভিউ পয়েন্ট।

বাস চলেছে পুরোনো ব্রিসবেনের গা দিয়ে। বাড়িঘর, কয়েদিদের থাকার জায়গা এইসব চোখে পড়ল। মহিলা কয়েদিদের আলাদা বাসস্থান ছিল। এই রাস্তাটার নাম স্ট্যানলি স্ট্রিট। স্টোরি ব্রিজ পেরিয়ে পৌঁছালাম পার্লামেন্ট ভবনে। সিডনি হারবার ব্রিজের নির্মাতা জন ব্যাডফিল্ডেরই হাতেই তৈরি এই ব্রিজ। সানকর্প স্টেডিয়ামটা বেশ বড়, অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার দর্শক বসতে পারবে। এখানে নিয়মিত রাগবি খেলা হয়।

www.amaderchhuti.com

বিয়াল্লিশ একর জমিতে তৈরি করা হয়েছে ট্রপিকাল পার্ক। এখানে জাকারান্ডা আর রবার গাছ চিনতে পারলাম। লাল রঙের একরকমের ফুল অনেক ফুটে রয়েছে গাছ আলো করে।

ব্রিসবেন শহর ছেড়ে চলেছি গোল্ড কোস্টের পথে। ড্রাইভার লু-ই এবার আমাদের পথপ্রদর্শক। সোনালি বেলাভূমি আর নীল সাগর নিয়ে 'গোল্ড কোস্ট'। সাগরতীরের এই শহরটাতে সবাই আসে ছুটি কাটাতে। সমুদ্রের ধারে তাই সারি সারি বিশাল বিশাল হোটেল আর রেস্তোঁরা। বিকেলবেলায় পৌঁছেছি। হোটেলের চোদ্দ তলার ব্যালকনিতে বসে উপভোগ করছি প্রকৃতিকে। সামনে অসীম সমুদ্র আর মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। প্রশান্ত সাগরের বড় বড় ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে। সৈকতে ভ্রমণ আর অবগাহনে ব্যস্ত অজস্র মানুষ।

সন্ধ্যেবেলা আধঘন্টা হাঁটার পর পৌঁছালাম ডিনারের জায়গায়। বড়দিন এসে গেছে - রাস্তার গাছগুলো রঙিন কাগজে আর আলোর মালায় সেজে উঠেছে। সমুদ্রের মৃদুমন্দ বাতাসে আলো ঝলমলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল।

২০ নভেম্বর

গতকাল সারাদিনটা কেটে গেছে ড্রিমওয়ার্ল্ডের নানারকম মজাদার রাইডে ঘুরে ঘুরে। আজ ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পরলাম সি-ওয়ার্ল্ড দেখতে। এখানে বরফ দিয়ে কৃত্রিমভাবে মেরু অঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করে পেঙ্গুইনদের রাখা হয়। নার্সারিতে ছোট ছোট পেঙ্গুইনদের যত্ন করে খাইয়ে দেওয়ার দৃশ্যও উপভোগ করার মতো। কবে আন্টার্টিকা যেতে পারব জানি না, তবে এখানে এসে পেঙ্গুইন দেখে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েও বেশ আনন্দ হল। পোলার বিয়ারও দেখলাম। এছাড়া ডলফিন, শীল আর হাঙরের নানারকম শো, থ্রি ডি শো এসব দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে দিনটা কেটে গেল।

ফিরে এসে বিকেল-সন্ধ্যেটায় সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটা, জলে পা ভেজানো, নীল-কমলা আকাশে সি-গালের উড়ে যাওয়া - সন্ধ্যে নেমে আসা... মনে থাকবে অনেকদিন।

২১ নভেম্বর

কেইর্নসের বিমান ধরলাম। বিমানবন্দরে নেমে দেখি আমাদের গাইড সুসান অপেক্ষা করছে। বাসে উঠে পড়লাম - যাব আদিবাসী গ্রাম দেখতে। জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার ফাঁকে সুসানের কথাগুলো কানে ভেসে আসছে। ১৭৭০ সালে ক্যাপ্টেন কুক প্রথম কেইর্নস-এ আসেন। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। ট্যুরিজমই এখানকার প্রধান জীবিকা তবে চাষবাসেও এই অঞ্চল বেশ উন্নত। মূলত নানাধরণের ফল ও আখের চাষ হয়। মাছব্যবসাও রোজগারের আরেকটা বড় উপায়। শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ব্যারন নদী।

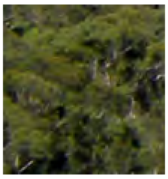

বাস একজায়গায় থামলে আমরা নেমে পড়লাম। রেন ফরেস্টের মাথার ওপর দিয়ে কেবল কারে চলেছি। এর আগে আমাজনের রেনফরেস্ট ঘুরে এসেছি, সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছিল। রোপওয়ে থেকে নামলাম জাপুকাইদের গ্রামে। এরাই এখানকার আদিবাসিন্দা। সেই প্রস্তর যুগ থেকে এদের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের খুঁটিনাটি রয়েছে এখানকার মিউজিয়ামে। তবে সবচেয়ে যেটা ভালো লাগল যে এরা নাচ-গানের ভিতর দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতিকে সুন্দর করে আমাদের সামনে তুলে ধরল। আর্ট গ্যালারি দেখে থিয়েটার হলে এলাম। এখানে স্থানীয় দুটি ছেলেমেয়ে কিছু অভিনয় করে দেখালো আর গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি করা একটা ব্লো-পাইপে নানারকম আওয়াজ করে শোনাল। সবচেয়ে মজার লাগল মা ক্যাঙারুর পিছনে বাচ্চা ক্যাঙারু হাঁটছে সেই শব্দটা - দুটোই বেশ আলাদা করে বোঝা যাচ্ছিল। এরপর মুক্তমঞ্চে আদিবাসী পোষাকে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা আদিম যুগে শিকার করা, কাঠে কাঠ ঘসে আগুন জ্বালানো এমন নানাকিছু আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলো। খুবই আনন্দ পেলাম যখন আমাদের সবাইকেও মঞ্চে ডেকে একসঙ্গে নাচগান করা হল। এ যেন নিছক দর্শক হয়ে না থেকে ওদের সংস্কৃতির সঙ্গে সত্যিকারের মিশে যেতে পারলাম। এরপর একটা বিশাল সবুজ মাঠের মধ্যে আদিবাসী ছেলেরা আমাদের বুমেরাং ছোঁড়া দেখাল। আমরাও যে যার মত ছুঁড়ে দারুণ মজা পেলাম।

এখান থেকে বেরিয়ে বাসে কিছুদূর গিয়ে এবার রেলভ্রমণ। কুরান্ডা রেলে চড়ে জঙ্গল আর পাহাড়ের অসাধারণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলা। পথে পড়ল ব্যারন নদীর ওপর ব্যারন ঝরনা এবং গর্জ। ব্যারন গর্জ ন্যাশনাল পার্ক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এরিয়া হিসেবে স্বীকৃত। প্রায় চল্লিশ লক্ষ বছর আগে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছিল ব্যারন নদী পরিবেষ্টিত এই অঞ্চল। ট্রেনের সব কম্পার্টমেন্টের দেওয়ালে 'বুডাউজি' নামে একটি সাপ কীভাবে গর্জটি খনন করেছিল সেই রূপকথা রেখায় রঙে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২২শে নভেম্বর

বাসে করে চলেছি জাহাজঘাটার দিকে। উদ্দেশ্য গ্রেট বেরিয়ার রিফ দেখা। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রবাল প্রাচীর। সাড়ে নটায় জাহাজ ছাড়লো - নব্বই মিনিটের সফর। ৬০ কিলোমিটার চলার পর জাহাজটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। এখানে একটা বড় বোট দাঁড়িয়ে আছে - রিফ পন্টুন (Reef Pontoon)। আমাদের জাহাজটা ঐ বোটের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। তারপর জাহাজ থেকে বোটে যাওয়ার জন্য একটা পাটাতন পেতে দিল - বেশ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যাচ্ছিল। দূরে দূরে বেশ কয়েকটি এরকম বোট দেখা যাচ্ছিল। গ্লাস বোটে করে চললাম কোরাল দেখতে। তারপর আবার সেমি সাবমেরিন ট্রিপ। এই ট্রিপটা খুবই ভাল লাগলো। আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপে গ্লাস বোটে করে কোরাল দেখেছি। কিন্তু সেমি-সাবমেরিন এই প্রথম। বোটের যে অংশটা জলের তলায় সেইখানে আমরা বসেছিলাম। ভিতরে বসে কাঁচের মধ্য দিয়ে নীল জলরাশি দেখতে দেখতে চলেছি - হঠাৎ দেখি পাহাড়ের উঁচু উঁচু মাথা - এটাই ত' প্রবাল প্রাচীর। কত বিচিত্র আকারের, রঙবেরঙের দেওয়াল - লাল, নীল, হলদে, চক্র কাটা। প্রাচীরের গায়ের কাছে আবার ছোট বড় অসংখ্য রঙিন রঙিন মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। এই রীফটার আয়তন ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার। এটা ন্যাশনাল পার্ক হেরিটেজ সাইট ঘোষিত হয়েছে। এর আবিষ্কর্তা ক্যাপ্টেন কুক। এই বোট থেকে আবার সবাই স্নর্কেলিং-এর জন্য সমুদ্রে নামছিল। জলে নামার পোষাকও নিচ্ছিল যাদের দরকার -লাইফ জ্যাকেট, চশমা - সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। আমিও সালোয়ার স্যুট পরে, চশমা পরে লাইফ জ্যাকেট সহ জলে নেমে পড়লাম। প্রশান্ত মহাসাগরের এই আকর্ষণ কি ছাড়া যায়। এরপর বোটেই ব্যুফে লাঞ্চের ব্যবস্থা। এলাহি ব্যাপার। সমুদ্রস্নানের পর এত রকমারি খাবার - ভালই উপভোগ করলাম।

২৪ নভেম্বর

গতকাল রাতে মেলবোর্নে পৌঁছেছি। এখানে দেখলাম সরকারি ট্রাম ফ্রিতে সিটি ট্যুর করায়। সকালে নিজেরাই বেরিয়ে পড়লাম ট্রামে করে শহর ঘুরতে। নদীর নামে ট্রামের নাম ইয়ারা। প্রত্যেক স্টপেজে ট্রাম থামিয়ে সেখানকার বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে। হারবার টাউনে নেমে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফেরার ট্রাম ধরলাম।

www.amaderchhuti.com

লাঞ্চের শেষে বাসে বেরিয়ে পড়লাম ফিলিপ আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। প্রথমে আমরা নামলাম চার্চিল আইল্যান্ড ভিজিটর সেন্টারে। এটা একটা পশুখামার। এত সুন্দর ভাবে পশুরা রয়েছে মনে হচ্ছে যেন এরা মুক্ত - হাঁস, মুরগী, ময়ূর কী সুন্দর চরে বেড়াচ্ছে। ল্যাভেন্ডারের বাগানও দেখলাম। এখান থেকে আমরা এলাম ফিলিপ আইল্যান্ডে। ১৯৯১ সালে এখানে বন্য কোয়ালা সংরক্ষণ সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। কোয়ালা অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশেষ পশু। এখানে অনেক ক্যাঙারুও দেখলাম আর দেখলাম প্রচুর পাখি। আশি রকম প্রজাতির পাখি এখানে আছে। এখানকার ক্যাঙারুগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট, এদের ওয়ালাবাই বলা হয়। তবে ফিলিপ আইল্যান্ডে সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য হল পেঙ্গুইন প্যারেড। জীবনে অনেক আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি, সবকিছুকে হার মানায় এই প্যারেড। এরা ভোরবেলা বেরিয়ে যায় সাগরের উদ্দেশ্যে। কোথায় ভেসে বেড়ায় কে জানে! কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার আগে ফিরে আসে নিজেদের ডেরায়। এদের প্যারেড দেখার জন্য সমুদ্রের তীরে নির্দিষ্ট জায়গায় গ্যালারি করা আছে। আমরা সময়মত এসে সবাই মিলে সেখানে বসে পড়লাম। অপেক্ষায় আছি কখন দেখবো। তারপর হঠাৎ দেখলাম একঝাঁক পেঙ্গুইন তীরে এসে উঠলো - ক্রমশঃ ঝাঁকে ঝাঁকে পেঙ্গুইন এসে জড়ো হতে লাগল। ওমা! তারপর দেখি ওরা লাইন করে এগিয়ে আসছে ডাঙার দিকে। আমরা দেখছি হাজার পেঙ্গুইন লেফট্ রাইট্ করতে করতে ক্রমশ উপরে আসছে - ওদের যেখানে থাকার জায়গা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে -শেষ আর হয় না...। এখানে ছবি তোলা নিষেধ। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু চেয়ে দেখা।

২৫ নভেম্বর

ব্যাগপত্র নিয়ে বাসে উঠে পড়লাম। মেলবোর্ন শহর দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব বিমানবন্দরে। আজকের গন্তব্য সিডনি। বাসে যেতে যেতে গাইডের কাছে জানতে পারলাম এখানকার লোকবসতি ৪০ লক্ষ। পনের বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মেলবোর্নের সংস্কৃতির কেন্দ্র ফেডারেশন স্কোয়ার। হেরিটেজ পার্কে রয়েছে ক্যাপ্টেন কুকের কলেজ। ১৮৫০ সালে নির্মিত ক্যাথিড্রালটিও দেখার মত। শহিদদের স্মরণে রয়েছে স্রাইন অব রিমেমব্রেনস। শহরের মাঝে অবস্থিত ইউরেকা স্কাই ডেক-এর অষ্টাশিতলা ওপর থেকে পুরো মেলবোর্ন শহরটাকে ছবির মত লাগল। টাওয়ারটি অবশ্য বিরানব্বই তলা। এছাড়াও রয়েছে রয়েল বোটানিক গার্ডেন, মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড এমন অনেক দ্রষ্টব্য। তবে এত কম সময়ে প্রায় কিছুই ভালো করে দেখা সম্ভব নয়।

২৬ নভেম্বর

ছবিতে দেখা সিডনি হারবার ব্রিজ ও সিডনি অপেরা হাউসের চেনা চেহারাটা দেখে খুব ভালো লাগল। পাহাড় কেটে তৈরি এই শহরকে ঘিরে রয়েছে মনোরেল। পাহাড়ি এলাকা বলে বেশ উঁচুনীচু। রাস্তাঘাট বা অনেক জায়গাই বিভিন্ন ব্রিটিশ গভর্নরদের নামানুসারে। প্রধান রাস্তা জর্জ স্ট্রিট। পুরনো সিডনি পোর্ট অঞ্চল।

বিকেলে সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে আর্ট গ্যালারিতে এলাম। গ্যালারির পাশে হাইড পার্ক। এখান থেকে চলে গেলাম অপরূপ সুন্দর বন্দী সৈকতে। দেখি অনেক লোকজন নিশ্চিন্তে জলে নেমে মজা করছে, ওরই মধ্যে আবার সাইরেন বেজে উঠল - হাঙর আসছে - হুড়মুড়িয়ে সবাই তীরে উঠে পড়তে লাগল - লাইফ বোটগুলোও বেশ সজাগ। ওখান থেকে হাডসন বে ঘুরে চলে এলাম বিখ্যাত অপেরা হাউস দেখতে। এই বাড়িটার ছাদ এমনভাবে তৈরি যে সমুদ্রের ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টির জলে আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। মেন হল দুটো - একটায় পনেরশো লোক ধরে আর একটায় ছাব্বিশশো। এই হলদুটোতে কনসার্ট আর অপেরা হয়। ছোট ছোট আরও কয়েকটা হল আছে। সবশেষে ডারলিং হারবারে এসে জাহাজে উঠলাম। সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার ফাঁকে নৈশাহার সেরে নেওয়া।

২৭ নভেম্বর

চলেছি ব্লুমাউন্টেনের পথে। ব্লুমাউন্টেনের এরিয়া বেলজিয়ামের অর্দ্ধেক - ঠিকমত ঘুরতে চাইলে অন্ততঃ সাত দিন সময় লাগবে পুরোটা দেখতে। এটা জাতীয়

উদ্যান। চারদিকে ইউক্যালিপ্টাসের সমারোহ। সাতশোর বেশি প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস আছে এখানে। ইউক্যালিপ্টাসের তেল যখন বাতাসে ভাসে তখন সূর্যের আলোয় নীল দেখায় - তাই এর নাম ব্লু মাউন্টেন। এর উচ্চতা ২০০ মিটার -এটা স্যান্ড স্টোন এবং লাইম স্টোনের পাহাড়। এখানে ইউরেনিয়াম জাতীয় খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। রাস্তার দুপাশে সবুজের সমারোহ -দু-মুখো রাস্তা -অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে -অনেক গাড়ি সবই চলেছে ব্লু মাউন্টেনের পথে। রাস্তার দুপাশে মাটিতে শুধুই হলদে ফুলের ঝোপ। রাস্তা এত চওড়া যে পাহাড়ে উঠছি বোঝাই যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে পাহাড়ের কাটা অংশ দেখে ঠাওর হচ্ছে। ১০১৭ মিটার ওঠার পর দেখি লেখা আছে কাটুমবা - জায়গাটার নাম। এখানে নেমে পাহাড়ি রাস্তায় ঝোপের মধ্যে দিয়ে সবাই হাঁটতে লাগলাম। পথে একটা ঝরনা পড়ল - এরও নাম কাটুমবা। আগে পাহাড়ের ওপর কয়লা খনি ছিল। এখনও সবই সাজানো রয়েছে - ছোট রেলপথ, তার ওপর কয়লাশুদ্ধ গাড়ি - গুহার মধ্যে সুড়ঙ্গপথে আলোর রেখায় দেখলাম খনিতে কর্মরত মানুষের মূর্তি - যেতে যেতে চোখে পড়ল দাবানলে পুড়ে যাওয়া সারিসারি কালো কালো পোড়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে স্কাইরেল চড়ে পাহাড়ের মাথায় খানিকটা ঘুরলাম। নেমে আবার জিগ্‌জাগ্ রাস্তা ধরে পাহাড়ি জঙ্গলে হাঁটা। দেখলাম ইকো পয়েন্ট আর থ্রি সিস্টারস্ রক।

এই তিন বোনকে নিয়ে একটা রূপকথার গল্প প্রচলিত আছে। আদিবাসী তিন বোন - মিনহি, বিমলা, গুনেডু তাদের বাবার সঙ্গে এই পাহাড়ে থাকতো। বাবা একজন উইচ ডাক্তার (ওঝা)। নাম তায়াওয়ান। আর পাহাড়েরই গভীর এক গুহায় থাকতো একটা রাক্ষস। নাম বুনউইপ। বাবা প্রতিদিন মেয়েদের নিয়ে বেরোতেন। গভীর গর্তের কাছে আসার আগে তিন মেয়েকে পাহাড়ের পাথরের দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে কাজে চলে যেতেন। একদিন বাবা চলে যাচ্ছেন ঠিক এমন সময় মেয়েরা তাদের সামনে একটা বিষাক্ত বিছে দেখতে পেল। মিনহি ভয় পেয়ে একটা পাথর দিয়ে বিছেটাকে মারতেই পাথরটা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে ভ্যালিতে আছড়ে পড়লো। সেই মুহূর্তে যত পশু পাখি ছিল সব দাঁড়িয়ে গেল - আর সঙ্গে সঙ্গে তিনবোনের পিছনে যে পাথরের দেওয়াল ছিল সেটা খুলে পড়ে গেল। রাক্ষসটা ভীত সন্ত্রস্ত ওই তিন বোনের দিকে এগোতে লাগল - নীচের ভ্যালিতে ওদের বাবা যখন দেখলেন রাক্ষসটা এগিয়ে যাচ্ছে ওদের একেবারে কাছে তখন তিনি তার যাদুদণ্ডটি (magic bone) মেয়েদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন আর তখনই তিনবোন পাথর হয়ে গেল। এদিকে মেয়েদের ধরতে না পেরে রাক্ষসটা বাবার দিকে তেড়ে গেল - বাবা যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি রাক্ষসের জালে আটকে গেছেন তখন তিনি নিজেকে একটি পাখিতে (Lyre) রূপান্তরিত করে ফেললেন এবং রাক্ষসের কবল থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর ম্যাজিক বোনটা গেল হারিয়ে। বুনউইপ) চলে যাওয়ার পর তায়াওয়ান ম্যাজিক বোনটা খুঁজতে লাগলেন। আজও তিনি তাঁর যাদুদণ্ডটা খুঁজে চলেছেন - মেয়েরাও আশায় আছে বাবা তাঁর দণ্ডটা পেলেই তারা আবার মানুষ হতে পারবে। আজও বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় লিয়র পাখিটি তার মেয়েদের ডেকে ডেকে বলছেন যাদুদণ্ডের খোঁজ তিনি করেই চলেছেন...।

[আগামী সংখ্যায় নিউজিল্যান্ড পর্ব]

~ তথ্য - অস্ট্রেলিয়া || অস্ট্রেলিয়ার আরো ছবি ~

ভারত সরকারের মহাগাণনিক দপ্তর থেকে অবসর নেওয়া মঞ্জুশ্রীর পায়ের তলায় সর্ষে। সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে আসেন এদেশ-ওদেশ। ছয় মহাদেশের মাটিতে পা রাখার পর এখন তাঁর স্বপ্ন আন্টার্টিকা ভ্রমণ।

tell a Friend

ঝটিকা সফরে সিঙ্গাপুর

মহম্মদ রাশেদুজ্জামান

~ তথ্য- সিঙ্গাপুর ‖ সিঙ্গাপুরের আরো ছবি - মহম্মদ রাশেদুজ্জামান ~

এয়ারপোর্ট থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড (এম আর টি) ট্রেনে আমি আর পিয়াস লিটল ইন্ডিয়া চলে এলাম। হোটেলে ব্যাগপত্র রেখে ফ্রেশ হয়ে ছুটলাম সেনটোসা আইল্যান্ডের দিকে। শুরু হলো আমাদের দুই বন্ধুর সিঙ্গাপুর ঝটিকা সফর।

মেরিনা বে সিঙ্গাপুরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। একে সিঙ্গাপুরের হার্টও বলা যায়। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন। নদীর একপাশে আধুনিক স্থাপত্যকলার অন্যতম নিদর্শন, বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোটেল মেরিনা বে স্যান্ড, কিছুটা দূরে আছে সিঙ্গাপুর ফ্লায়ার। সিঙ্গাপুরের জাতীয় প্রতীক মারলায়ন এবং থিয়েটারও এইখানেই।

নদীর চারপাশে সব বিখ্যাত স্হাপত্য ছাড়াও সারিসারি আকাশছোঁয়া ভবন ও বিশ্বের নামিদামী হোটেলগুলো জায়গাটার সৌন্দর্যে অন্যমাত্রা এনেছে। জনপ্রতি ৩০ সিঙ্গাপুর ডলার দিয়ে নৌকায় প্রায় দেড় ঘন্টা ঘুরলাম। রিভারসাইডের সারিসারি আলো ঝলমলে রেস্তোঁরা আর নানা রঙের, নানা বর্ণের মানুষজন দেখতে দেখতে কখন সময় কেটে গেছে বুঝতেই পারিনি।একমুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যেন ইটালির ভেনিস শহরে চলে এসেছি।এখানে রাত আরও মোহময়ী। মেরিনা বে স্যান্ড হোটেলের অতিপ্রাকৃতিক লেজার শো আর ব্যাকগ্রাউন্ড সুরের মূর্ছনা এক অপার্থিব জগতে নিয়ে যায়।

এখানের আরেক আকর্ষণ পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্যাসিনোটি।স্কাই পার্ক নামে পরিচিত এই ভবনের নির্মাতা লাস ভেগাস স্যান্ডস। থাকার জন্য কক্ষ রয়েছে ২৫৬১টি। রয়েছে ১,২০,০০০ বর্গমিটারের কনভেনশন সেন্টার,৭৪,০০০ বর্গমিটারের মারিনা বে স্যান্ডস মল, একটি জাদুঘর, দুটি বড় আকারের সিনেপ্লেক্স, বিখ্যাত শেফ দ্বারা পরিচালিত ৭টি খাবারের রেস্তোরাঁ, দুটি ভাসমান ক্রিস্টাল প্যাভিলিয়ন এবং ৫০০টি টেবিল ও ১৬০০ স্লট মেশিন বিশিষ্ট পৃথিবীর বৃহত্তম ক্যাসিনো। এই ভবনের ওপরে রয়েছে ৩৯০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্কাই পার্ক এবং ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ইনফিনিটি সুইমিং পুল।

www.amaderchhuti.com

সিঙ্গাপুর ভ্রমণের সবচেয়ে রকিং আর থ্রিলিং পার্ট ছিলো ইউনিভারসাল স্টুডিও মুভি থিম পার্ক ভ্রমণ। এটা এখনো পর্যন্ত আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতার একটা। বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি দেখে,একটা সাধারণ থিম পার্ককে কতটা ক্রিয়েটিভ ভাবে সাজানো যায়! এখানে ঢুকতে জনপ্রতি ৭৪ সিঙ্গাপুর ডলার লাগে। পার্কের ভেতরে ঢুকেই আঁতকে উঠেছিলাম খোদ "মেরিলিন মনরো"-র এর ভূত দেখে। তারপর সামলে নিয়ে ওনার সাথে ছবিও তুলে ফেললাম। একটু সামনে গিয়ে দেখি বিশাল জাহাজ টাইটানিক। আরও একটু এগিয়ে মাদাগাস্কায় গিয়ে দেখলাম ছোট একটা প্লেন ক্র্যাশ করে গাছের সাথে আটকে আছে আর পাইলটের মরা দেহটা ঝুলে থাকতে থাকতে কঙ্কাল হয়ে গেছে। সেখান থেকে 'ফার ফার অ্যাওয়ে'-তে গিয়ে দেখা হল মিস্টার আর মিসেস শ্রেক-এর সঙ্গে। তারা দিব্যি মানুষজনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর বিখ্যাত ডিজনিল্যান্ড ক্যাসেলের হলে শ্রেক ফোর ডি মুভি দেখলাম। এখানে রয়েছে লস্ট ওয়ার্ল্ড-এর বিখ্যাত মুভি ওয়াটার ওয়ার্ল্ড এর স্টেজ। সেখানে তিন ভাঁড় কিছু সময় সবার গায়ে পানি ছিটিয়ে বেশ তামাশা করলো। তখন বুঝলাম ফোর ডি হলের সামনে কেন তিন ডলারের রেইন কোট বিক্রি করছিলো। খানিকটা পানির ঝাপটা আমাদের গায়েও এসে লাগলো। তারপর শুরু হলো মেইন শো। নায়ক ,নায়িকা, ভিলেন সমৃদ্ধ টানটান উত্তেজনাপূর্ণ একটা নিঁখুত অ্যাকশন মুভি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম।

জুরাসিক পার্কেও দেখি তিন ডলারে রেইন কোট বিক্রি হচ্ছে। আবার পানিপুনি নাকি? এমনিতে ওয়াটার ওয়ার্ল্ড শো দেখে মাথা ভিজে! আবার কি হয় না হয় ভেবে আর রিস্ক নিলাম না, কিনলাম একটা রেইন কোট। আমার অবুঝ বন্ধুটি কিনলো না। শেষে তাকে পাঁচ ডলার দিয়ে মেশিনে দাঁড়িয়ে কাপড় শুকোতে হয়েছিলো। জুরাসিক পার্কে জঙ্গলের মধ্যে একটা তীব্র স্রোতধারার সরু নদীর স্রোতের সাথে এক প্রকার যুদ্ধ করতে করতে আপনাকে এগুতে হবে। এসময় জঙ্গল থেকে আচমকা দৈত্যাকার অনেকগুলা ডাইনোসর যদি আপনাকে খাওয়ার জন্য ছুটে আসে তাহলে কি আত্মা খাঁচায় থাকবে?

'দ্য রিভেঞ্জ অফ মামি' নামে একটা ভয়াবহ রাইড আছে।যেটাতে দূর্বল হার্টের কেউ চড়লে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একশো শতাংশ! না বুঝে ওই রাইডে চড়ে চোখে তারা দেখতে দেখতে বের হয়ে দেখি,মমি সিনেমার হিরো "ব্যান্ডন ফ্রেজারের" ভুত হেব্বি ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সাথে ছবি তুলতে গিয়ে দেখি বিশাল লাইন তাই আর ছবি তোলা হলো না।

আমরা ইউনিভারসাল স্টুডিওতে ঢুকেছিলাম বেলা ১১টার সময় আর এখন বাজে প্রায় ৪টে।এতটা সময় কীভাবে গেল বুঝতেই পারি নি। কিন্তু এখন পেট কথা বলা শুরু করেছে।পিয়াসের টায়ার্ড ভাবসাব দেখেও না দেখার ভান করলাম। ম্যাপে দেখলাম আর একটা এরিয়া বাকি আছে। সেটা হলো সাই ফাই সিটি। নামেই বুঝা যায় এ পর্যন্ত যা যা দেখলাম তারচেয়ে অনেক বেশি চমক ওখানে হয়তো অপেক্ষা করছে। তাই আমার জোরাজুরিতে বন্ধু নিমরাজি হলো। অবশ্য কিছুসময়ের জন্য স্নাক্স, জুস আর বিড়ি বিরতি দিতে হলো।

সাই ফাই সিটিতে গিয়ে দেখি জটিল সব ঘোরপ্যাঁচ মারা ট্র্যাক দিয়ে দুটা রোলার কোস্টার অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটছে। সাথে কোস্টারের যাত্রীদের প্রবল চিৎকার। সেটা ভয়ে না কি আনন্দে বোঝা মুশকিল! আমি আর পিয়াস রোলার কোস্টারে উঠলাম। আমাদের চশমা,ক্যামেরা, পিয়াসের ঘড়ি সব কাউন্টারে নিয়ে নিলো।আমি

এটাতে উঠে এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছিলাম। যা বর্ণনার অতীত। সেখান থেকে গেলাম ট্রান্সফরমার রাইডে। ওটা আমার কাছে সবচেয়ে সেরা মনে হয়েছে। একটা অবিশ্বাস্য রকম উত্তেজনাপূর্ণ রাইড ছিলো। মেগাট্রন আর অপটিমাস প্রাইডের তুমুল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বশরীরে আপনাকে যেতে হবে। মেগাট্রন আপনাকে বারবার মৃত্যুর মুখে ফেলবে কিন্তু অপটিমাস প্রাইড মুহূর্তের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করবে। কারণ পৃথিবীকে বাঁচানোর জিনিসটা যে তখন আপনার হাতে। যেটা রাইডের শুরুতেই অপটিমাস প্রাইড আপনাকে দিয়ে দেয়।

সাই ফাই সিটিতে গিয়ে দেখি জটিল সব ঘোরপ্যাঁচ মারা ট্র্যাক দিয়ে দুটা রোলার কোস্টার অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটছে। সাথে কোস্টারের যাত্রীদের প্রবল চিৎকার। সেটা ভয়ে না কি আনন্দে বোঝা মুশকিল! আমি আর পিয়াস রোলার কোস্টারে উঠলাম। আমাদের চশমা,ক্যামেরা, পিয়াসের ঘড়ি সব কাউন্টারে নিয়ে নিলো।আমি এটাতে উঠে এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছিলাম। যা বর্ণনার অতীত। সেখান থেকে গেলাম ট্রান্সফরমার রাইডে। এটা আমার কাছে সবার সেরা মনে হয়েছে - অবিশ্বাস্য রকম উত্তেজনাপূর্ণ রাইড। মেগাট্রন আর অপটিমাস প্রাইডের তুমুল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বশরীরে আপনাকে যেতে হবে। মেগাট্রন আপনাকে বারবার মৃত্যুর মুখে ফেলবে কিন্তু অপটিমাস প্রাইড মুহূর্তের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করবে। কারণ পৃথিবীকে বাঁচানোর জিনিসটা যে তখন আপনার হাতে। যেটা রাইডের শুরুতেই অপটিমাস প্রাইড আপনাকে দিয়ে দেয়।
ওখান থেকে বের হয়ে আমরা দুই বন্ধু একদম থ' হয়ে গেছি। কেউ কোন কথা বলছিলাম না। আস্তে আস্তে হাঁটা দিলাম নিউয়র্ক শহরের দিকে। আর একটা বিখ্যাত ভূত দেখলাম, তার নামটা অবশ্য জানি না। একটা পুরো দিনের শেষে ইউনিভারসাল স্টুডিও থেকে বের হলাম।
সারাদিন ঘুরেফিরে শেষমেষ দুই বন্ধু ৭৫ সিঙ্গাপুর ডলার বা মাথাপ্রতি ২৫০০ টাকার একটা অতি লাক্সারি বাসে ক্লান্ত শরীরে ঘুমাতে ঘুমাতে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

~ তথ্য- সিঙ্গাপুর ‖ সিঙ্গাপুরের আরো ছবি - মহম্মদ রাশেদুজ্জামান ~

www.amaderchhuti.com

পেশায় ব্যবসায়ী রাশেদুজ্জামানের ইচ্ছে কর্মজগতের শত ব্যস্ততার ফাঁকে সময় পেলেই পৃথিবীর পথেপথে ঘুরে বেড়াবার। স্বপ্ন দেখেন দুনিয়ার ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততম আলো ঝলমলে নগরীগুলো দুচোখ ভরে দেখে নেওয়ার।

Rate This : - select -
Total Votes : 10
Average : 3.10

Like One person likes this.

tell a Friend

ছুটির আড্ডা

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

ঈশ্বর-প্রকৃতি-ভ্রমণ

অদিতি ভট্টাচার্য

কৌশানি পৌঁছেই ঠিক করেছিলাম পরের দিন চৌকরি যাবার আগে বৈজনাথ আর বাগেশ্বর দেখে যাব। কৌশানি থেকে বৈজনাথের দূরত্ব ষোলো কিলোমিটারের মত। বৈজনাথ উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলার একটা ছোট শহর - গোমতী নদীর তীরে, গরুড় উপত্যকায়, মোটামুটি এগারোশ মিটার উচ্চতায়। শহরটার নামই হয়েছে বৈজনাথ মন্দিরের নাম থেকে। বৈজনাথ আসলে ভগবান শিব বা বৈদ্যনাথের মন্দির যা থেকে অপভ্রংশে বৈজনাথ হয়েছে।

www.amaderchhuti.com

মূল রাস্তা থেকে অনেকগুলো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোমতী নদীর ধার দিয়ে বৈজনাথ মন্দিরে পৌঁছতে হয়। যাবার রাস্তাটা খুব সুন্দর। গোমতীর ধারে ফুলে সাজানো সুন্দর বাগান। বাগান আর নদীর ধার দিয়ে কিছুদূর গিয়ে মন্দির। বৈজনাথ মন্দিরকে শুধু মন্দির বললে ভুল বলা হবে। আসলে এটা অনেকগুলি মন্দিরের সমাবেশ - বৈজনাথ গ্রুপ অব টেম্পলস।

প্রস্তর নির্মিত বৈজনাথ মন্দির তৈরি হয়েছিল দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে। নির্মাণ করেছিলেন কত্যুরী বংশের রাজারা। বৈজনাথ শহর ছিল কত্যুরী রাজাদের রাজধানী যার তৎকালীন নাম কার্তিকেয়পুরা আর এই উপত্যকার নাম ছিল কত্যুর। মন্দিরে যাওয়ার জন্যে যে সিঁড়িগুলো দিয়ে নামতে হয় সেগুলোও কোনো এক কত্যুরী রানীর আদেশেই তৈরি। কথিত আছে এখানে গোমতী আর গরুড়গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে শিব পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। পুরাণের গল্পকথা বাদ দিলেও এখানে এলে যা মুগ্ধ করে তা হল বৈজনাথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শান্ত, নির্জন পরিবেশ আর অসাধারণ দৃশ্যপটের ব্যাকগ্রাউণ্ডে এই মন্দিরগুলো বছরের পর বছর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোহিত বা পাণ্ডার জোরজুলুম নেই, পুজো দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের ইচ্ছে মতো মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়িয়ে প্রাণভরে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করা যায়। নৈঃশব্দের মাঝে কানে আসে শুধু গোমতী নদীর কলকল বয়ে যাওয়া। মন্দিরের ভেতরে শিব, পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ছাড়াও বাইরের গাত্রে পাথরের কারুকাজের মাঝে কালো পাথরের পার্বতী মূর্তি। দুটো একই রকম মন্দির আছে যা টুইন টেম্পলস নামে পরিচিত।

গোমতী নদীতে প্রচুর মাছ। এখানে মাছ ধরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই স্বচ্ছ জলের মধ্যে তাদের নির্ভয় ঘোরাফেরা স্বচ্ছন্দে ক্যামেরাবন্দি করা যায়। আর জলের ওপর মাছের খাবার ছড়ালেতো কথাই নেই। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভিড় করে আসে।

পরের গন্তব্য বাগেশ্বর। বাগেশ্বর নাম এসেছে ব্যাঘ্রেশ্বর থেকে। বাগেশ্বর শহর অবস্থিত সরযূ আর গোমতী নদীর সঙ্গমস্থলে। সরযূ নদী - শুনলেই মনে পড়ে যায় সেই কোন ছোটবেলায় পড়া রামায়ণের গল্প যার শুরুই ছিল সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী। দুই নদীর সঙ্গমের একদম কাছেই বাগেশ্বরের অতি প্রাচীন বাঘনাথ মন্দির। যদিও মন্দিরে পৌঁছতে হয় অনেকটা হেঁটে বাজার দোকানের মাঝখান দিয়ে। এই মন্দির গড়ে উঠেছিল চাঁদ রাজবংশের রাজত্বের সময়ে। কথিত আছে ভগবান শিব এখানে বাঘের রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই এটি বাঘনাথ মন্দির। শিবরাত্রিতে এখানে বিরাট মেলা বসে। মন্দিরের পাশে সরযূ নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে বেশ ভালো লাগে। সরযূ গোমতীর সঙ্গে মিলেমিশে বেশ বিশালকায়। আশেপাশে আরও কয়েকটা মন্দির আছে। গোমতী আর সরযূর সঙ্গমস্থলে শ্মশান রয়েছে। সরযূ নদীর ধারে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে রওনা দিলাম চৌকরির উদ্দেশে।

সংখ্যাতত্ত্ববিদ অদিতির কাছে বই আর অক্সিজেন সমতুল্য। কর্মসূত্রে বছর খানেক আরব দুনিয়ায় বসবাসের অভিজ্ঞতাও আছে। ছবি তোলা,এম্ব্রয়ডারির পাশাপাশি ভালোবাসেন নানা জায়গায় বেড়াতে আর বেড়ানোর কাহিনি লিখতে।

Rate This : - select -
Total Votes : 11
Average : 3.36
Like 10 people like this.
tell a Friend

জল আর পাখিদের দেশে

বনশ্রী চক্রবর্তী

||ভেম্বানাদ লেকের ছবি ||

যতদূর চোখ যায় শুধু নীল আর সবুজ...। প্রকৃতি যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে তার সব সৌন্দর্য। কেরালার ভেম্বানাদ লেকের ধারে বসে চা খেতে খেতে খানিকক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম নিজের শহুরে জীবনটাকে।

ভারতের সব চেয়ে লম্বা লেক এটাই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল সকালের জলখাবার খেয়ে স্পিডবোটে ঘোরার, সেইমত বেরিয়ে পড়লাম। প্রচন্ড বেগে জল কেটে ছুটে চলা বোটে বসে জলের ছিটেয় ভিজে যাচ্ছিলাম সবাই। বেশ মজা লাগছিল। কোনমতে জলের ছিটে থেকে ক্যামেরা বাঁচিয়ে ছবি তোলা। দাঁড়ানোও যাচ্ছেনা ঠিকমত। লেকের টলটলে নীল জলের নীচে চোখে পড়ছে মাছেদের খেলা আর ওপরে নানান পাখির ভেসে যাওয়া।

বিকেল চারটে নাগাদ আবার বেরোনো সান-সেট ক্রুইজে। খোলা আকাশের নীচে লঞ্চে বসে বাঁশি আর মৃদঙ্গের সুর শুনতে শুনতে ভেসে চলেছি। আকাশের মুখ ভার - আমাদেরও মনটা একটু খারাপ খারাপ - সূর্যাস্ত দেখা যাবেতো? পাখিরা সব বাসায় ফিরছিল, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কখনোবা একঝলক বিকেলের আলো - মনে হচ্ছিল এইতো স্বর্গ...। জেটিতে পৌঁছানোর আগেই বৃষ্টি নামল - ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে আমরা ভিজছি আর মাথার ওপর মেঘ ও রৌদ্রের খেলা! পরদিন ঠিক সকাল পাঁচটায় বেরিয়ে পড়া - গন্তব্য কুমারাকোম বার্ড স্যাংচুয়ারি। চেনা-অচেনা গাছপালার একটা বড় অংশ রবার গাছ। গাইডকে সঙ্গী করে স্যাংচুয়ারির অরণ্যের গভীরে ঢুকতেই কানে এল নানান পাখির ডাক। আমরা যে সময়টায় গিয়েছিলাম তখন ছিল পাখিদের নেস্টিলিং সিজন। ডিম ফুটে সবে ছোট্ট ছোট্ট পাখির বাচ্চারা মাথা বার করছে। একজায়গায় এসে গাইড বললেন জঙ্গলে একটু ঢুকলেই বাদুড়ের কলোনী দেখা যাবে। সেখানে পৌঁছে দেখি ওরে বাবা গাছে গাছে তা বোধহয় প্রায় হাজার দশেক বাদুড় ঝুলে আছেতো হবেই। এত বাদুড় আমি কখনো একসাথে দেখিনি। আর কিছুটা এগোলেই ওয়াচটাওয়ার, ওখান থেকে খুব ভালো পাখি দেখা যাবে - গাইডের এই আশা আর আশ্বাসের ঠেলাতেই ক্লান্ত শরীরে আমরা পৌঁছে যাই অভীষ্টে। যত এগোচ্ছি ততই বাড়ছে পাখির কিচিরমিচির। অবশেষে ওয়াচটাওয়ারে ওঠার পর মনে হল এতটা পথ হাঁটা সত্যিই সার্থক - একেবারে যেন সেই ক্রৌঞ্চ দ্বীপে পাখিদের রাজ্যেই পৌঁছে গেছি। নানান প্রজাতির অন্তত হাজারদশেক পাখি রয়েছে - কেউ উড়ছে, কেউ বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, কেউবা বসেছে ডিমে তা দিতে, কেউবা বাচ্চাকে দিচ্ছে প্রথম ওড়ার পাঠ। তারমধ্যেই চলছে যেন ঝগড়াঝাটি-মানঅভিমানের পালাও। ছবি তুলব না শুধু ওদেরই দেখব ঠিক করে উঠতে পারছি না। গাইড চেনান হেরণ, স্টর্ক, পিন টেল ডাক, কর্মোরেন্ট, ইগ্রেট, টিল, ডার্টার, পেঁচা, কোকিল আরও হরেক জানাঅজানা পাখিদের। মনে হচ্ছিল অমলের ঠাকুরদাদার মতোই বলি আহা এখানেই যদি থেকে যাওয়া যেত, কেবল ডানা নেই এই যা - ফিরে যেতে যেতে মনের ডানায় ভর করে আবার আসব কথা দিলাম।

পেশায় শিক্ষিকা বনশ্রী ভালবাসেন বেড়াতে এবং প্রকৃতি আর বন্যপ্রাণির ছবি তুলতে।

Rate This : - select -
Total Votes : 11
Average : 3.36
Like 10 people like this.
tell a Friend

একদিন সারাদিন কুমিল্লায়

রফিকুল ইসলাম সাগর

বৃহত্তর কুমিল্লার সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের ইতিহাস - শত শত বছরের পুরনো রাজা-প্রজাদের বাড়ি-ঘর, রানিদের জন্য নির্মিত দিঘি ও পুকুর ঘাট, ব্রিটিশদের কবরস্থান, আরও নানান পুরাকীর্তি।

ইতিহাসের সেই স্পর্শ নিতে একদিন হঠাৎ করেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা ক'জন। সকাল ছটায় মাইক্রোবাসে ঢাকা থেকে রওনা। মাত্র দেড় ঘণ্টাতেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। কুমিল্লায় নূরজাহান হোটেলের সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ওখানকারই আরও দুই বন্ধু। সবাই মিলে হোটেলেই সকালের নাস্তা সেরে নিলাম।

প্রথমে গেলাম 'কুমিল্লা বার্ড' ঘুরে দেখতে। ভেতরে সবকিছু বেশ সাজানো-গোছানো - উঁচু-নিচু পথ, নানারকমের গাছ-গাছালি, সবকিছুতেই যত্নের ছোঁয়া। এর পরের গন্তব্য কোর্টবাড়ি। কোর্টবাড়ি রুব্বান মুড়ায় আছে পুরাকীর্তির সম্ভার। পুরোনো বাড়িগুলির অধিকাংশই এখন মাটির নীচে। এখান থেকে সংগ্রহ করা কিছু মূর্তি ও জিনিসপত্র বর্তমানে জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এত বড় চত্ত্বরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক্লান্তই হয়ে পড়েছিলাম।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যেই পৌঁছালাম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত কবরস্থান ওয়ার সিমেটারিতে। মেঘলা দিনে ব্রিটিশদের সেই সাজানোগোছানো নির্জন সুন্দর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল আমরা যেন বিদেশে আছি। কুমিল্লা মূল শহরের কাছাকাছি ইপিজেড এলাকা। সেখানে সরকারি হাসপাতালের পাশে কুমিল্লা বিমান বন্দর। বিমান বন্দরটি অনেক পুরানো। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এখানে মিত্র বাহিনির বিমান ও সামরিক ঘাঁটি ছিল। এখান থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক অপারেশন চালানো হয়েছে - প্রধানত বার্মা ও চিনে। আহত সৈন্যদের চিকিৎসা হত কুমিল্লা সামরিক হাসপাতালে। যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই শায়িত রয়েছেন ওয়ার সিমেটারিতে।

রেল স্টেশনের কাছে দুপুরের খাবার খেলাম। কুমিল্লা থেকে ভারতের সীমান্ত খুব কাছে। সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হলো। বড়জ্বালা সীমান্ত ফাঁড়ি পার করে ভিতরের দিকে গেলাম। সেখানের বাসিন্দারা নাকি প্রায়শঃ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করতে পারব কিনা। সে বললো না, আপনারা যেহেতু এখানে অপরিচিত তাই ভিতরে প্রবেশ করা যাবেনা। শুধু মাত্র পাসপোর্ট ভিসা থাকলে প্রবেশ করা যায়, নাহলে বিপজ্জনক। অবৈধ প্রবেশ হিসেবে গণ্য হবে। যেকোনো রকমের বিপদ হতে পারে। ভারতের সীমান্তর কাছাকাছি পৌঁছানোর পর লক্ষ্য করলাম সাইনবোর্ডে লেখা আছে সামনে ভারতের সীমান্ত রেখা, অতিক্রম নিষেধ।

এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে রাতের খাওয়া সেরে ঢাকার বাসায় ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত হয়ে গেল।

www.amaderchhuti.com

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ফাউন্ডেশন কোর্সে পাঠরত রফিকুলের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়। পড়াশোনার পাশাপাশি বেড়ানো আর ভ্রমণ সাংবাদিকতা তাঁর পছন্দের বিষয়।

"ছুটির আড্ডা" - পরের পাতা

Rate This : - select -
Total Votes : 11
Average : 3.36

Like 10 people like this.

tell a Friend